পুঁজিবাদের পরিণাম

ও

সর্বোদয় অর্থব্যবস্থা

গোবিন্দপ্রসাদ মাইতি

সর্বোদয় প্রকাশনী মণ্ডল
বনানী, কলিকাতা-৩২

প্রকাশক :
বিধূভূষণ দাসগুপ্ত
সর্বোদয় প্রকাশনী মণ্ডল
বনানী
কলিকাতা-৩২

১৫ই আগষ্ট ১৯৫৪
৩০শে শ্রাবণ ১৩৬১

মূল্য একটাকা চার আনা মাত্র

মুদ্রক :
শ্রীঅজিতকুমার বসু
শক্তি প্রেস
২৭।৩বি, হরি ঘোষ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

সূচী

প্রথম অধ্যায়—পৃঃ ১-৮

দ্বিতীয় অধ্যায়—পৃঃ ৯-৪৪

কেন্দ্রীয় অর্থব্যবস্থা

(সৃষ্টিতত্ত্ব—সাধন গ্রহণে হিংসা ও অহিংসা—হৃদয় পরিবর্ত্তন—বিবর্ত্তনবাদ—ব্যক্তি ও সমাজ—পরিবেশের প্রভাব—ভৌতিক আবশ্যকতা—সাম্যবাদ ও সাম্যযোগ—বিতরণ ব্যবস্থায় পরিবার নীতি—বহুমত ও গণতন্ত্র)—শ্রেণীহীন সমাজ।

সর্বোদয় অর্থব্যবস্থা

ভূমিকা

আজ সারা সংসার এক বিকট সঙ্কটে প'ড়ে গেছে। একদিকে অন্ন-বস্ত্রের অভাবে লোক হাহাকার করছে অন্যদিকে বড় বড় সহর এবং সহরতলীর বাজার বিলাসের দ্রব্যে ভরপুর। একদিকে পৃথিবীর নেতৃবর্গ বেকার সমস্যার সমাধান করতে না পেরে চিন্তাকুল অন্যদিকে সেই নেতারাই নানারকম কল-কৌশলের আবিষ্কার ক'রে মানুষকে কি ক'রে ফুরসুৎ দেওয়া যায় সেই চিন্তায় রত। একদিকে পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা একজোটে বসে শান্তির পরিকল্পনা করছেন, অন্যদিকে প্রত্যেক রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম তৈরী করবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা লেগে রয়েছে। এই দোটানার মধ্যে প'ড়ে মানুষ আজ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়।

বস্তুতঃ সংসারে যখন এই প্রকার বিপত্তি আসে তখনই এক একজন যুগপুরুষের আবির্ভাব হয়। তাই গান্ধিজীর জন্ম হ'ল মানুষকে এই সঙ্কট থেকে উদ্ধার করবার জন্য। যুগে যুগে যখনই এই প্রকার মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন, তাঁরা মানব সমাজকে—যে পুরানো পথে চলে মানুষ দুঃখ পাচ্ছে সে পথ ছেড়ে—একটা নতুন পথে চলবার রাস্তা দেখান। কিন্তু পুরাতন সংস্কারগ্রস্ত রক্ষণশীল সমাজ প্রথমতঃ সে পথে চলবার ভরসা পায় না—কেবল ভরসা পায় না এমন নয়—পুরাতনের মোহে নতুনের বিরুদ্ধে সংগঠিত সংগ্রামও করে। কিন্তু বিপ্লবপন্থী যুগপুরুষ কোনও দিকে ভ্রুক্ষেপ না ক'রে সমাজকে তাঁর মুক্তির মন্ত্র দিয়ে যান।

ক্রমশঃ সঙ্কটাকুল মানব যখন পুরাতনের মধ্যে সম্পূর্ণ দিশেহারা হ'য়ে যায় তখন আবার সেই যুগপুরুষের মন্ত্রের দিকে আকৃষ্ট হয়।

ভারতে গান্ধী মন্ত্রেরও সেই অবস্থা। গান্ধিজীর মন্ত্র হ'তে বিমুখ হ'য়ে দেশ পাশ্চাত্য পুঁজিবাদ, মার্ক্সবাদ ইত্যাদির পিছনে দৌড়াদৌড়ি করছিল কিন্তু সেই সব পুরাতন পন্থার ভিতর আলো না পেয়ে এখন ধীরে ধীরে গান্ধীর মন্ত্র কি সেটা জানবার জন্য আকৃষ্ট হচ্ছে।

ঠিক এই সময় গোবিন্দভাই "পুঁজিবাদের পরিণাম ও সর্বোদয় অর্থব্যবস্থা" লিখে, আজকের যুগের শিক্ষিত যুবকদের গান্ধীবাদকে বুঝবার কাজে যথেষ্ট সহায়তা করেছেন। আমার বিশ্বাস আজকের শিক্ষিত যুবকরা এই ছোট পুস্তিকা হ'তে ভাববার অনেক মশলা পাবে। একঘেয়ে যন্ত্রবাদ, পুঁজিবাদ বা মার্ক্সবাদের কথা ভাববার মধ্যে এ থেকে একটা নতুন আলোক পাবে।

আমি বাংলার প্রত্যেক যুবককে এই পুস্তিকাখানি পড়ে গভীর ভাবে চিন্তা করতে বলি।

ধীরেন্দ্র মজুমদার
অধ্যক্ষ, অখিল ভারত সর্বসেবা সংঘ

নিবেদন

অর্থশাস্ত্রের বিদ্যার্থী হিসাবে দেশের আর্থিক রচনার প্রকৃত উপায় অনুসন্ধান করার দৃষ্টি নিয়ে নিজের ক্ষুদ্র শক্তিমত দেশসেবার কাজে আছি। এই কাজে দেশের যুবক সমাজ, তরুণ ছাত্র ও শিক্ষক সমাজ এবং নানা দেশসেবকের নিবিড় সম্পর্কে আসার সুযোগ হচ্ছে।

এতে দুটী জিনিষ আমার নজরে পড়ছে। প্রথমতঃ দেখছি বর্ত্তমান জগতের নানা মতবাদের চক্রে—শুধু যুবক বা ছাত্রসমাজ নয়—আমরা সকলেই বিভ্রান্ত। পুঁজিবাদ, সমাজবাদ সাম্যবাদ এবং এইগুলির নানা শাখাপ্রশাখা দিনরাত আমাদের মনে নানা আলোড়নের সৃষ্টি করছে, আমরা যেন পথ খুঁজে পাচ্ছিনা।

দ্বিতীয়তঃ দেখছি বর্ত্তমান সঙ্কটাকুল পরিস্থিতিতে যে সর্বোদয় মতবাদ জগতে এক নূতন যুগের অবতারণা করছে, যারদিকে পৃথিবীর চিন্তাশীল লোকমাত্রেই আকৃষ্ট হয়েছেন, যার প্রচারে এবং যে ধারায় সমাজ রচনার জন্য শতশত কর্মী আত্মনিয়োগ করেছেন এবং করতে চাইছেন, এমন একটী গভীর তত্ত্বপূর্ণ মতবাদ যা বিশ্বের শুধু আর্থিক কাঠামো নয়—রাজনীতিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক—এক কথায় সারা মানবসমাজ এবং মানব জীবনের সম্পূর্ণ কাঠামোটী বদলে একেবারে নতুন ছাঁচে গড়তে উদ্যত, সে সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় সংক্ষিপ্ত এবং সহজ-বোধ্য একখানি বই একান্ত দরকার।

এই দুই কারণে কিছু লিখবার প্রেরণা জাগে এবং কিছু লিখি। কিন্তু পরে বিশেষ করে আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীধীরেন্দ্র মজুমদার মহাশয়, অধ্যক্ষ সর্বসেবাসঙ্ঘ এবং আমার স্নেহের ভাই সর্বোদয়কর্মী

শ্রীশৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের (যার বর্ত্তমান প্রচলিত সমস্ত মতবাদ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা রয়েছে) আগ্রহে বইখানি প্রকাশ করলাম।

প্রচলিত সমস্ত মতবাদের তুলনামূলক অধ্যয়নের বিষয়বস্তু কঠিন হলেও বইখানি সকলের সহজবোধ্য হবে এবং ছাত্র এবং জনহিতকামী ব্যক্তি মাত্রেরই কর্মপন্থা নির্ণয়ে সহায়ক হবে এই আমার বিশ্বাস। সমগ্র মানবসমাজই এক পরিবার, মানবমাত্রেরই কল্যাণ আমাদের কাম্য এই দৃষ্টিতে সমাজরচনার অনুকূল তত্ত্ব এবং কার্য্যকরী পন্থা নির্ণয়ের চেষ্টা করেছি।

গোবিন্দপ্রসাদ মাইতি

প্রথম অধ্যায়

১। **অর্থব্যবস্থার অর্থ** ঃ—অর্থব্যবস্থা বল্‌তে—খাওয়া, পরা, জমিজমা, ঘর-দুয়ার, খাদ্যের উৎপাদন, বিতরণ, শিল্প উদ্ভাবন, প্রসারণ এবং প্রবর্তন আদির ব্যবস্থা বা সোজা কথায় আমাদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা বুঝায়।

এই ব্যবস্থা চালু করতে হ'লে আমাদের অনেক কথা ভাব্‌তে হয়। প্রকৃতির কোলে শুধু আমি নই বা আমার দেশ নয় আমরা অনেক মানুষ এবং পৃথিবীর অনেক দেশ রয়েছে। শুধু তাই নয়, মানুষ ছাড়া প্রকৃতির আরও কোটী কোটী সন্তান রয়েছে। সেই কোটী সন্তানের মধ্যে আমরা অন্যতম। কিন্তু আমরা সকলে পরস্পর সম্বন্ধ সূত্রে আবদ্ধ। কাজেই গ্রাসাচ্ছাদনের বেলায় অন্ততঃ নিম্ন কয়েকটী কথা ভাবা দরকার :—

(১) প্রাকৃতিক সম্পদের সারত্ব বজায় রাখা,

(২) পারস্পরিক যোগসূত্রে সম্পদগুলির শ্রীবৃদ্ধি করা এবং সম্পদগুলি এমন ভাবে কাজে লাগানো যাতে যুগপরম্পরায় জীবগণ এবং পৃথিবীর সমস্ত দেশ এবং দেশের সকল স্তরের লোক সেই সম্পদ ভোগ ক'রে নিজেদের অন্তর্নিহিত গুণ ও শক্তি বিকাশের সমান সুযোগ পায়।

২। **অর্থব্যবস্থার আবশ্যকতা** ঃ—অন্যান্য জীবের তুলনায় আমাদের জীবন অত্যন্ত জটিল। এই জটিল জীবনকে সমাজবদ্ধ এবং সংঘবদ্ধ অবস্থায় রাখ্‌তে হলে যতদূর সম্ভব পাকাপাকি ব্যবস্থা না ক'রে উপায় নাই।

সাধারণতঃ যারা প্রকৃতির সঙ্গে যত বেশী মিশে থাকে তাদের আবশ্যকতার প্রকার (Variety) তত কম হয় এবং সেই আবশ্যকতা পূরণে ঝামেলা বা জটিলতাও তত কম থাকে। অনেক ক্ষেত্রে সেই আবশ্যকতার পরিমাণ হয়ত খুব বেশী কিন্তু সেই পরিমাণ জিনিষের ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত যত সহজে করা যায়, আমাদের বেলায় তা হয় না। একটা গরু বা একটা ঘোড়ার আবশ্যকতা হয়ত আমাদের চেয়ে পরিমাণে ঢের বেশী কিন্তু সেই পরিমাণ আবশ্যকতার ব্যবস্থা যত সহজে করা যায় আমাদের আবশ্যকতা সেই অনুপাতে অনেক কম হওয়া সত্ত্বেও সেইটুকু পূরণ কর্‌তে তার চেয়ে অনেক বেশী ঝামেলা পোয়াতে হয়। কেননা অন্য জীবের তুলনায় আমরা প্রকৃতির তালে কমই চলি। আমাদের খাওয়া পরা, মাথা, থাকা ইত্যাদি প্রত্যেকটী বিষয়ে আমরা প্রকৃতি থেকে অনেক দূরে। অন্যান্য জীবের মত স্বাভাবিক প্রকৃতিজাত খাদ্যে আমাদের পোষায় না। আমাদের গ্রহণোপযোগী খাদ্য উৎপাদন করতে হয়। সেই খাদ্য উৎপাদনে জমি হিসাবে এবং ঋতু হিসাবে নানা প্রকার কৃষি সরঞ্জামের দরকার হয়।

আমরা স্বাভাবিক প্রকৃতিজাত অধিকাংশ কাঁচা জিনিষ খেতে পারি না, রান্না করতে হয়। কাঁচাকে পাকা করা এবং পাকাকে রান্না করার জন্য অনেক রকম ব্যবস্থা করতে হয়। এই ব্যবস্থার জন্য অনেক রকম জিনিষের দরকার হয়। ধান চাষের জন্য চাই লাঙ্গল, বলদ, কোদাল, আদি কৃষি সরঞ্জাম ; ধান ভানার জন্য চাই ঢেঁকি, যাঁতা ; রান্নার জন্য চাই হাঁড়ি, কুঁড়ি, হাতা, চামচ, বাসনপত্র ইত্যাদি কত কি। শরীরটাকে বাঁচাবার এবং অনেক ক্ষেত্রে জিভের পরিতৃপ্তির জন্য খাওয়ার রকমারি এবং রান্নার রকমারির সীমা নাই।

আমরা অন্যান্য জীবের মত প্রকৃতির কোলে বস্‌তে পারি না।

চাই আমাদের জন্য ঘর। ঘর আবার এখন পাকা না হ'লে অনেকের চলছে না। আমরা মাটিতে শুইতে পারি না, চাই আমাদের জন্য বিছানা খাট, পালঙ্ক—তা' ও আবার নানা রকমের।

আমরা ন্যাংটা থাক্‌তে পারি না। লজ্জা-নিবারণ এবং শীত-গ্রীষ্ম থেকে বাঁচবার জন্য চাই কাপড়-চোপড়। প্রকৃতি থেকে দূরে সরে সরে এখন আমরা এমন অবস্থায় পৌঁছেছি যে আমাদের বেশভূষার কোনও সীমা নাই। কত ঢং-এর এবং কত রং বেরং-এর—তারও কোনো ইয়ত্তা নাই। সৃষ্টিতে আমরা এমন একটা জীব যার জীবনধারণ প্রণালী অন্য জীবের তুলনায় অত্যন্ত জটিল।

এদিকে আমরা সামাজিক জীব, সমাজবদ্ধ হয়েই থাকি। যাযাবরের মতো এখন আর ঘুরে বেড়াতে পারি না। এখন লোকসংখ্যা বেশী হ'য়েছে। এখন আর যে কোন জমিতে ইচ্ছামত বসবাস করতে পারি না বা যে কোন জমি ইচ্ছামত আবাদ করতে পারি না।

এইরূপ জটিলতাপূর্ণ জীবনকে সুখময় শান্তিময় ক'রে তুল্‌তে হ'লে এবং এইরূপ শ্রেষ্ঠ জীবনকে শ্রেষ্ঠত্বের চরম সীমায় নিয়ে যেতে হ'লে একটা অতীব সুন্দর ব্যবস্থার দরকার। যেহেতু গ্রাসাচ্ছাদন ব্যবস্থা আমাদের জীবনের সমস্ত অংশকে স্পর্শ করে এবং এ'কে অবলম্বন ক'রেই আমাদিগকে শ্রেষ্ঠত্বের চরম সীমায় পৌঁছতে হয় কাজেই এই ব্যবস্থাই আমাদের পক্ষে প্রধান এবং একমাত্র জিনিষ।

৩। গ্রাসাচ্ছাদনের বর্তমান রূপঃ

আমাদের এই গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা নিয়ে আজ সারা পৃথিবীতে বেশ একটা হৈ চৈ প'ড়ে গেছে। কোথাও শান্তি নাই। যে দেশ স্বাধীন সেখানেও যেমন পরাধীন দেশেও তেমনি। সর্বত্র মারামারি, টানাটানি ও হানাহানি। একে অপরকে ধ্বংস ক'রে নিজের অস্তিত্ব

বজায় রাখবার জন্য সতত উদ্যত। আমাদের জীবনযাত্রার পথ ক্রমশঃ এত জটিল হ'য়ে যাচ্ছে যে শেষ পর্যন্ত আমরা কোথায় পৌঁছবো ভগবান জানেন।

পৃথিবীর আবাদযোগ্য জমির প্রায় ১২½% অংশ এখন আবাদ করা হয়েছে। অর্থব্যবস্থা ভাল করতে পারলে এতেই পৃথিবীর সকল লোকের জীবন বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে কেটে যেতে পারে। কোথাও কোনও প্রকার যুদ্ধ বিগ্রহ বা মারামারির প্রশ্ন উঠ্তে পারে না। আজ পৃথিবীর সর্বপ্রকার অশান্তির মূল কারণ এই নীতিবিহীন, উদ্দেশ্যবিহীন এবং আদর্শবিহীন অর্থব্যবস্থা। বীণা থেকে তখুনি সুমিষ্ট স্বর বেরোয় যখন তার প্রত্যেকটী তারের সঙ্গে প্রত্যেকটী তারের সমস্বর-প্রবণ সম্বন্ধ থাকে। কোনটা খুব বেশী কড়া এবং কোনটা খুব ঢিলা হ'লে সুরের কোন মাধুর্য থাকে না। আজ ব্যক্তির জীবনতন্ত্রের সঙ্গে সমাজ জীবনতন্ত্রের এবং এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের কোনও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্বন্ধ নাই। এই অর্থব্যবস্থার বিশৃঙ্খলার জন্য আজ পৃথিবীতে এত অশান্তি!

বর্তমান যুগে কোনও ব্যক্তি বা কোনও দেশ পৃথিবীর কোনও অংশ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখ্তে পারে না। প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের সম্বন্ধ। সমস্ত পৃথিবীই আজ এক পরিবার। প্রত্যেকে নানা সম্বন্ধ সূত্রে আবদ্ধ। কিন্তু এই আদর্শবিহীন এবং উদ্দেশ্য-বিহীন অর্থব্যবস্থার জন্য আমাদের পারিবারিক জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। আজ পৃথিবীর সর্বদেশে অর্থব্যবস্থায় এমন কিছু রোগ ঢুকেছে, যার নিরাকরণ না হওয়া পর্যন্ত ভারতের প্রকৃত সুখশান্তি লাভ বা আমাদের উপরিউক্ত উদ্দেশ্যগুলি সিদ্ধ হওয়া অসম্ভব।

৪। **অর্থব্যবস্থার স্বরূপ** ঃ—এই ব্যবস্থা আমাদের সম্পূর্ণ জীবনকে

স্পর্শ করে। কাজেই এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ কাজে হাত দেওয়ার আগে আমাদের জীবনের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য এবং সমাজের প্রতি আমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে জানা দরকার।

(১) মনুষ্য জীবনের শ্রেষ্ঠত্ব :—

আমরা সকলেই জানি এবং বলি ভগবানের সৃষ্টজীবের মধ্যে মনুষ্য-জীবনই শ্রেষ্ঠ—আমাদের মনুষ্যত্ব বিকাশেই আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব। মনুষ্যত্ব বল্‌তে ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সু-কু, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি বিচার করবার এবং বোধ করবার ক্ষমতা; ভগবানের সৃষ্ট জীবের সঙ্গে নিজেকে এক ক'রে ভাববার ক্ষমতা; আপনাকে সমস্ত জীবের মধ্যে এবং সমস্ত জীবকে নিজের মধ্যে দেখবার ক্ষমতা বুঝায়। এই বোধকে আমরা দয়া-মায়া, স্নেহ-মমতা-সৌহার্দ্য-ভ্রাতৃত্ব-বাৎসল্য প্রভৃতি নানা প্রকার গুণ বলি। এই গুণগুলি যার যত আছে তার মনুষ্যত্ব তত বেশী বিকশিত। সে ততই মনুষ্যপদবাচ্য। এ'কে কেন্দ্র ক'রেই আমাদের জীবন। আমাদের খাওয়া পরা মাখা বা এক কথায় আমাদের বেঁচে থাকার যদি কোন সার্থকতা থাকে ত' এরই জন্য এবং অর্থব্যবস্থার যদি কোনও আবশ্যকতা থাকে ত' এ'কে কেন্দ্র ক'রেই।

(২) ভ্রাতৃত্ববোধ :—

পৃথিবীর সৃষ্ট জীবমাত্রই ভগবানের সন্তান। এই হিসাবে মানুষ মাত্র সকলেই ভাই ভাই। কাজেই একদিকে ভগবদ্দত্ত এই প্রাকৃতিক সম্পদ ভোগ ক'রে বেঁচে থাক্‌বার এবং মানবোচিত এই গুণগুলির বিকাশ কর্‌বার অধিকার যেমন সকলের সমান, অন্যদিকে অপরকে বাঁচিয়ে রাখ্‌বার এবং উন্নত করবার কর্তব্যও তেমনি সকলেরই সমান। দৈহিক বা বৌদ্ধিক শক্তির জোরে অথবা প্রাকৃতিক সুখ সুবিধার সুযোগবশতঃ কাহাকেও এই অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা পাপ।

(৩) আবশ্যকতা কম করা :—

খাওয়া-পরা মাথা বা শরীর ধারণই আমাদের জীবনের লক্ষ্য নয়, কিন্তু এটী আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে একান্ত সহায়ক এবং অনিবার্য। কাজেই এ'কে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যতটুকু আবশ্যক ততটুকু ব্যবস্থা করাই আমাদের ধর্ম। তার অতিরিক্ত করা অধর্ম। যদি দু'খানি জামায় এবং দুখানি কাপড়ে কাজ চলে তার অতিরিক্ত রাখা বা ব্যবহার করা অন্যায়। গান্ধীজীর ভাষায় ইহাই অপরিগ্রহ।

(৪) ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য :—

বিভিন্নতাই সৃষ্টির বৈচিত্র্য। একটী ফুলের সঙ্গে অপর একটী ফুলের বা একটী মানুষের সঙ্গে অপর একটী মানুষের সম্পূর্ণ মিল কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। শারীরিক গড়ন, বুদ্ধি, রুচি আদি প্রতেকটী বিষয়ে একের সঙ্গে অপরের সম্পূর্ণ মিল থাকে না। কেউ মোটা, কেউ সরু, কেউ দুর্বল, কেউ সবল, কেউ বেশ মেধাবী, কেউ বোকা, কারও চিত্রাঙ্কনে রুচি, কারও বিজ্ঞানে সাহিত্যে সঙ্গীতে। এইভাবে স্বভাব চরিত্রে বেশভূষায় প্রত্যেকটী বিষয়ে কিছু না কিছু বিভিন্নতা বিদ্যমান। এই বিভিন্নতাই সৃষ্টির সরসতা এবং মৌলিকতা। এই প্রকার বিভিন্নতাই ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য বা ব্যক্তিত্ব। যা' কিছু ব্যবস্থা এই ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্যই। অর্থব্যবস্থা এমন হওয়া দরকার যাতে প্রত্যেক মানুষ তার ব্যক্তিত্ব বিকাশে সমান সুযোগ পায়। সে যেন জড়বৎ বা যন্ত্রবৎ কোন ব্যবস্থার অঙ্গ হ'য়ে না দাঁড়ায়। তা'র ভিতরের বিশেষত্বটুকু যেন সম্পূর্ণরূপে ফুটে উঠে।

(৫) শোষণবৃত্তি :—

ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধার জন্য সুযোগ পেলেই অপরকে কাজে লাগাবার একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আমাদের আছে। এই

প্রবৃত্তি সর্বদা অপরকে শোষণ করতে চায়। কাজেই অর্থব্যবস্থা এমন হওয়া দরকার যাতে কোথাও কোন প্রকার শোষণের অবকাশ না থাকে।

(৬) সামাজিকতা ও সহযোগিতা :—

সামাজিকতা আমাদের একটা স্বতঃপ্রবৃত্তি (instinct)। অন্যান্য জীবের ন্যায় আমাদের জীবনও পরস্পর সাপেক্ষ। অধিকন্তু আমাদের আবশ্যকতা এত বেশী এবং এমন ধরণের যে আমরা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় সবগুলি পূরণ করতে পারি না—পরস্পরের সহযোগেই পূরণ করি। এতে প্রত্যেকেই উপকৃত হয়—প্রত্যেকেরই স্বতঃপ্রবৃত্তির সম্যক বিকাশ হয়।

এই দৃষ্টিতে চিন্তা করলে এটা বেশ স্পষ্ট বুঝা যায় যে একের প্রতি অপরের ভালবাসা, অপরের উপকার, সব কিছুই পরস্পরের মঙ্গলের জন্যই। পরস্পরের সহযোগেই পরস্পরে উপকৃত হয়। পারস্পরিক সহযোগিতাই সৃষ্টির স্বাভাবিক ব্যবস্থা। এই স্বাভাবিক ব্যবস্থার মূলতত্ত্ব বজায় রেখেই অর্থব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়।

(৭) প্রকৃতিদত্ত শক্তির সদুপযোগ :—

আমাদের সমাজে বালক-বৃদ্ধ, স্ত্রী-পুরুষ, অন্ধখঞ্জ, ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের লোক থাকে। সকলের কাজ করবার শক্তি সমান নয়। কেউ ভারি কাজ করতে পারে, কেউ হাল্কা; কেউ ঘরের ভিতরে কাজ করতে পারে, কেউ বাহিরের। সমাজকে একটা পরিবার হিসাবে ধ'রে অর্থ-ব্যবস্থা এমন করতে হবে যাতে সমাজের সকল লোকে যোগ্য কাজ পায়। যে যার যোগ্য কাজ পেলে তার প্রকৃতিদত্ত শক্তির সদুপযোগ হয়। প্রত্যেকের শক্তির সদুপযোগেই জাতি কর্মক্ষম থাকে। জাতির প্রত্যেক অংশকে কর্মক্ষম রাখা মানে জাতিকে সজীব রাখা। কাজেই

অর্থব্যবস্থা এমন করা দরকার যাতে জাতি সজীব থাকে। জাতির ধ্বংস হয় এই প্রকৃতি প্রদত্ত শক্তির অনুপযোগ বা অসদুপযোগে।

৫। অর্থব্যবস্থার লক্ষ্য :—

(১) যোগ্যতা এবং সফলতার সহিত সম্পদ সৃষ্টি,

(২) সম্পদের সমউপভোগ,

(৩) জনগণের মৌলিক আবশ্যকতার পরিপূরণ আগে করা, তারপর অন্য আবশ্যকতায় হাত দেওয়া,

(৪) ব্যক্তিত্বের সম্যক বিকাশসাধন, এবং

(৫) সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা।

৬। অর্থব্যবস্থার প্রকার :—

অর্থব্যবস্থা প্রধানতঃ দুই প্রকার—(১) কেন্দ্রীয় এবং (২) বিকেন্দ্রীয়। কোনও বিশেষ ব্যক্তি, সম্প্রদায়, বা সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত উৎপাদন এবং বিতরণ ব্যবস্থাকে কেন্দ্রীয় এবং জনসাধারণের প্রত্যেকের প্রত্যক্ষ সহযোগে নিয়ন্ত্রিত ও পরস্পর সাপেক্ষমূলক স্বাবলম্বী অর্থব্যবস্থাকে বিকেন্দ্রীত অর্থ ব্যবস্থা বলা হয়। কেন্দ্রীয় অর্থব্যবস্থায় সমাজের আবশ্যকতার কোনও হিসাব না ক'রে এক একটী কেন্দ্রে বহুল পরিমাণে উৎপাদন করা হয়, আর বিকেন্দ্রীয় ব্যবস্থায় সমাজের বিভিন্ন কেন্দ্রে সমাজের আবশ্যকতানুযায়ী উৎপাদন করা হয়।

———

দ্বিতীয় অধ্যায়

কেন্দ্রীয় অর্থব্যবস্থা

পুঁজিবাদের জন্ম ও তার মোটামুটি রূপ :—

উৎপাদনের কেন্দ্রীকরণ থেকেই পুঁজিবাদের জন্ম। মোটা কথায় পুঁজিবাদ মানে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য আবশ্যকীয় মাল উৎপাদনের সাধনের উপর কোনও ব্যক্তি, শ্রেণী বা রাষ্ট্রের একচ্ছত্র অধিকার বুঝায়। এতে উৎপাদনের তিনটী সাধন—জমি, পুঁজী এবং শ্রমের উপর, ক্ষেত্র বিশেষে এদের একটী বা তিনটীর উপর ব্যক্তিগত মালিকানা হয়। এই মালিকানার রূপ চার ভাবে প্রকাশ পায়—ভূমিপতি, মহাজন, শেঠ বা বড় বড় ব্যবসায়ী এবং কারখানার মালিক।

ভূমিপতিদের দুইভাগে ভাগ করা যায় (১) জমিদার—যারা প্রচুর জমির মালিক কিন্তু নিজেরা জমি আবাদ করে না। মজুর লাগিয়ে, ভাগ দিয়ে, সাঁজা দিয়ে বা এই প্রকার কোন ব্যবস্থায় আবাদ ক'রে উপস্বত্ব ভোগ করে। দ্বিতীয় শ্রেণীর ভূমিপতি যারা কারখানার উপযোগী মাল উৎপাদনের জন্য প্রচুর জমি নিজেদের অধিকারে রাখে এবং প্রচুর শ্রমিক লাগিয়ে মাল উৎপাদন করে।

(২) মহাজনবর্গ—মহাজনেরা কেন্দ্রীয় প্রথায় উৎপাদনরত লোকদিগকে পুঁজী সরবরাহ করে। পুঁজী সুদে খাটায় এবং বড় বড় কারখানার অংশীদার সাজে।

(৩) শেঠ বা ব্যবসায়ীবর্গ :—শেঠ বা বড় বড় ব্যবসায়ীরা কারখানা এবং উপস্বত্ব ভোগীদের মধ্যবর্তী লোক। কারখানাজাত মাল উপভোক্তাদের বাড়ী বাড়ী পৌঁছে দেওয়ায় এদেরই হাত। এরা দালাল এবং ছোট ছোট ব্যবসায়ীর দ্বারা এই কাজ করে। এই

মধ্যবর্তী কাজের লাভের উপরই এদের আজীবিকা। উৎপাদন এবং বিতরণ উভয় ক্ষেত্রেই এদেরই হাত বেশী। এই কাজে দেশের প্রভূত শ্রমশক্তি এদেরই হাতে থাকে।

(৪) কারখানার মালিকবর্গ:—বিশেষ ক'রে কাঁচা মালকে পাকা করাই কারখানার মালিক শ্রেণীর কাজ। এই কাজে একদিকে যেমন প্রভূত শ্রমশক্তির দরকার হয় অন্যদিকে তেমনি বুদ্ধিশক্তিরও। দেশের শ্রমিককুল, গবেষক, ইঞ্জিনিয়ার, কণ্ট্রাক্টার, কারিগর ইত্যাদি থাকে এদেরই মুঠার মধ্যে। দেশের বাজার এদেরই হাতে। এরা উৎপন্ন মালের দাম বাড়াতে বা কমাতে পারে। স্ক্ষ্মভাবে বিচার ক'রলে দেখা যাবে দেশের লোকের জীবনের চাবি থাকে এদেরই হাতে।

কোনও আকস্মিক কারণে এই ব্যবস্থার জন্ম হয়নি। প্রকৃত পক্ষে পুঁজিবাদ তার নিজ মূর্তি ধ'রলো খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে। বড় বড় যন্ত্রপাতির আবিষ্কার হওয়ার পর ধীরে ধীরে এই ব্যবস্থা ক্রমে দানা বাঁধে। লোকে আগে যেখানে আবশ্যকীয় প্রায় সব জিনিষ অতি সাধারণ সাধনের দ্বারা উৎপন্ন এবং ব্যবহারযোগ্য করতো, ক্রমে সেগুলিতেও বড় বড় যন্ত্রপাতির সহায়তা নিতে আরম্ভ করলো। স্বভাবতঃই বড় বড় যন্ত্রে মালের উৎপাদন বেশী হয়। তখন সমস্যা দাঁড়ায় বাজারের বা বিক্রয়ের। মাল এত বেশী হয় যে স্থানীয় বাজারের চাহিদা মিটিয়ে দূরবর্তী বাজারে পাঠাবার দরকার হয়। আগে কাপড়, তেল, নুন এবং অন্য যাবতীয় আবশ্যকীয় জিনিষ লোকে পরস্পর সহযোগে নিজেদের দরকার মতই প্রস্তুত করতো, বড় বাজার বা দূরস্থ বাজার খুঁজবার বা সৃষ্টি করবার কোন প্রশ্নই ছিল না। বড় বড় যন্ত্রপাতি দিয়ে উৎপাদন এত বাড়লো যে দূর দূরস্থ বাজারে পাঠিয়ে বিক্রয় করা ছাড়া গত্যন্তর রইল না। ক্রমে দূরস্থ বাজার বাড়লো, উৎপাদনের পরিমাণ বাড়লো এবং সঙ্গে সঙ্গে এক একটি বড় বড় উৎপাদন কেন্দ্রের সৃষ্টি হলো।

কেন্দ্রীয় অর্থব্যবস্থার প্রকার :—

কেন্দ্রীয় অর্থব্যবস্থা দুই প্রকার—ব্যক্তি অধিকারমূলক এবং সমষ্টি অধিকারমূলক। যন্ত্রপাতি, জমি, শ্রম এবং মূলধনের উপর ব্যক্তিগত অধিকার জন্মলে তাকে ব্যক্তি অধিকারমূলক এবং সমগ্র রাষ্ট্রের অধিকার জন্মলে তাকে সমষ্টিমূলক অর্থব্যবস্থা বলা হয়। বর্তমান অর্থশাস্ত্রের ভাষায় একটি পুঁজিবাদী, অপরটি সমাজবাদী বা সাম্যবাদী অর্থব্যবস্থা। প্রথমে আমরা পুঁজিবাদী কেন্দ্রীয় অর্থব্যবস্থার কথা আলোচনা কর্‌ব।

স্বরূপ :—

(১) যন্ত্রপাতির উপর অধিকার :—কেন্দ্রীয় অর্থব্যবস্থায় বড় বড় যন্ত্রপাতির দ্বারাই সর্বপ্রকার আবশ্যকীয় জিনিষ উৎপাদন করা হয়। বড় বড় যন্ত্রপাতি যে কোনও লোকের পক্ষে করা সম্ভব হয় না। যাদের অর্থ আছে, বুদ্ধি আছে অথবা প্রভাব আছে, তারাই বেশী দামের যন্ত্রপাতি, জমি বা শ্রমের ব্যবস্থা ক'রে বড় বড় যন্ত্রপাতির ব্যবহার কর্‌তে পারে এবং সেই সমস্ত যন্ত্রপাতির সাহায্যে অধিক পরিমাণে মাল উৎপাদন এবং বিতরণ ক'রতে পারে। বড় বড় যন্ত্রপাতির সঙ্গে সঙ্গে দেশে বড় বড় কল-কারখানার সৃষ্টি হয়। ক্রমে বড় বড় শেঠ ও মহাজনের হাতে উৎপাদন এবং বিতরণের চাবিকাঠি এসে পড়ে। এইভাবে কোথাও একটা শ্রেণীর (যাদের আমরা পুঁজিপতি বলি) হাতে অধিকার কেন্দ্রীভূত হয় আর কোথাও বা রাষ্ট্রের হাতে।

(২) জমির উপর পুঁজিপতি শ্রেণীর অধিকার :—

বড় বড় যন্ত্রপাতির দ্বারা বহুল পরিমাণ পাকামাল উৎপাদন করবার জন্য বহুল পরিমাণ কাঁচামালের দরকার হয়। যেমন একটা রাইস মিলের জন্য চাই হাজার হাজার মণ ধান। একটা জুট মিলের জন্য চাই হাজার হাজার মণ পাট। এইভাবে একটা সুগার মিলের জন্য

শত শত মণ আখ বা একটা অয়েল মিলের জন্য শত শত মণ সরিষার দরকার হয়। উৎপাদনের সাধন হচ্ছে বড় বড় যন্ত্র। কাজেই যন্ত্রের মালিকরাই এই সমস্ত কাঁচামাল কিনে। কেননা কিনবার সামর্থ্য তাদেরই বেশী। কাজেই কাঁচামালের উৎপাদকেরা (কৃষকেরা) তাদেরই কাছে মাল হাজির করে। এদিকে মিল মালিকেরাও কাঁচামাল উৎপাদনে তাদের (কৃষকদের) সাহায্য করে। তাদের টাকা দাদন দেয়। কৃষকেরা তাদেরই নির্দ্দেশমত এবং তাদেরই আবশ্যকমত স্ব স্ব জমিতে কাঁচামাল উৎপাদন ক'রতে থাকে। এতে প্রত্যক্ষভাবে না হ'লেও পরোক্ষভাবে মিল মালিকেরাই জমির প্রকৃত মালিক হ'য়ে বসে এবং কৃষকেরা আইনতঃ নিজের জমির মালিক হ'য়েও সেই জমি থেকে ফসল উৎপাদনে কার্যতঃ মিল মালিকদেরই মজুরে পরিণত হয়। এইভাবে চাষীকুল সম্পূর্ণরূপে এদেরই ক্রীড়নক হ'য়ে দাঁড়ায়। মিলমালিকেরা অনেক সময় কাঁচামালের দাম বাড়িয়ে চাষীকে প্রলুব্ধ করে। সেই প্রলোভনের জালে যখন চাষীকুল বেশী জড়িয়ে পড়ে তখন মালিকেরা দাম কমিয়ে দেয়। তখন তারা কাঁচামাল রাখতেও পারে না আর এদিকে মালিকদের সংঘবদ্ধতার জন্য দূরে মাল পাঠাবার অবকাশও থাকে না। ফলে সুবিধা পেয়ে মালিকেরা জলের মত সস্তায় জিনিষ কিনে— অনেক সময় কিনেও না। এই রকম অবস্থায় অনেক সময় চাষীদিগের সেই কঠিন পরিশ্রমজাত কাঁচামাল পুড়িয়ে ফেলতে হয়। এইভাবে পুঁজিপতিরা কৃষকদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলে।

বড় বড় পুঁজিপতিরা বা মিল মালিকেরা প্রাকৃতিক সুবিধানুযায়ী এবং অনেক সময় তাদের ব্যবসায়ের সুবিধামত বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ জিনিষ উৎপাদনের ব্যবস্থা করে। এক একটা এলাকায় এক এক রকম জিনিষ বেশী পরিমাণে উৎপাদনে কৃষকদের লাগায়। তাদের চাহিদার প্রলোভনে কৃষকেরা নিজেদের

জন্য অন্য আবশ্যকীয় জিনিষ উৎপাদন বন্ধ ক'রে সেই সমস্ত জিনিষই বেশী পরিমাণে উৎপাদন করার দিকে ঝুঁকে পড়ে।

মিল মালিকদের লক্ষ্য থাকে উৎপাদন ব্যয় কম করার দিকে। সাধারণতঃ উর্বর জমিতেই উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষাকৃত কম হয়। কাজেই উর্বর জমিগুলি মিল মালিকদের আওতায় এসে যায়। উর্বর জমিতে বিভিন্ন রকমের শস্য—অন্ততঃ যা খেয়ে মানুষ বেঁচে থাক্‌তে পারে—উৎপাদন করা যায়। কিন্তু মিল মালিকদের আওতায় আসার ফলে তা' আর সম্ভব হয় না। তারা তাদের ব্যবসায় বা বাজারের সুবিধা অনুযায়ী মাল উৎপাদন করায়।

এই ব্যবস্থায় দেখা যাচ্ছে, দক্ষিণ ভারতের মালাবার অঞ্চলের অনেক জমিতে লোকে গমচাষ ও ধানচাষ বন্ধ ক'রে প্রচুর পরিমাণে নারিকেল চাষ কর্‌ছে। বিহার, যুক্তপ্রদেশ ও মাদ্রাজের অনেক জমিতে লোকে খুব বেশী ক'রে আখ এবং তামাক চাষ কর্‌ছে। বাংলাদেশের অনেক জমিতে পাট, শণ, মাদুরকাঠি, বাবুই ঘাস ইত্যাদি উৎপাদনে লোকে লেগে পড়েছে।

এইভাবে এক একটা এলাকায় মিল মালিকদের চাহিদামত এক এক রকমের জিনিষ উৎপাদন হচ্ছে। এতে প্রকৃতপক্ষে মিল মালিকেরাই জমির মালিক হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

(৩) শ্রমের উপর পুঁজিপতিদের অধিকার ঃ—

আমাদের যাবতীয় আবশ্যকীয় জিনিষ উৎপাদনে বড় বড় যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হ'লে ব্যক্তিগতভাবে আর কারও পক্ষে কোনও জিনিষ উৎপাদনের সুবিধা থাকে না। বড় বড় কল কারখানায় শ্রমিকেরা জমা হয়। উৎপাদনের প্রধান সাধন জমি, যন্ত্রপাতি, এবং অর্থ পুঁজিপতিদের হাতে আসে। শ্রমিকদের আর নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা সম্ভব হয় না।

সমষ্টি অধিকারমূলক অর্থব্যবস্থা :—

শ্রেণীপ্রাধান্যমূলক বা পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় যে ভাবে জমি, যন্ত্রপাতি এবং শ্রমের উপর পুঁজিপতি শ্রেণীর অধিকার জমে, রাষ্ট্র বা সমষ্টিঅধিকারমূলক বা সমাজবাদী অর্থব্যবস্থায় ঠিক সেই ভাবে উক্ত সাধনগুলির উপর রাষ্ট্রের প্রাধান্য জমে। এটাকে সংগঠিত ধনতন্ত্র বলা যেতে পারে।

আজ পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই এই শ্রেণীপ্রাধান্যমূলক অর্থব্যবস্থা রয়েছে। কেবল রুশ এবং চীন দেশেই এ'কে রাষ্ট্র প্রাধান্যমুলক ক'রবার চেষ্টা চলছে। রুশ দেশের প্রায় সমস্ত সম্পত্তি ষ্টেটেরই সম্পত্তি। ব্যক্তিগত সম্পত্তি নাই বল্লেও চলে। জমি-জমা, ছোট বড় কল-কারখানা, ফার্ম, সমিতি আদি সমস্তই ষ্টেট বা সরকারেরই। সেখানে ডাইরেক্টার, অফিসার, ম্যানেজার, মজুর সকলেই সরকারের কল-কারখানায় বা ফার্মে কাজ করে এবং সকলেই সরকারের তরফ থেকে তাদের জীবিকার জন্য বেতন পায়। সরকারী আমদানির প্রায় ৭০ অংশ বিভিন্ন (উদ্যোগ) কারবার থেকে হয়। সমস্ত (উদ্যোগে) কারবারে সরকারই পুঁজী লাগায়। সমস্ত উৎপাদন এবং বিতরণ ব্যবস্থা থাকে সরকারেরই নিয়ন্ত্রণে। সমস্ত আয় সরকারেরই।

(৪) কেন্দ্রীকরণের কারণ প্রধানতঃ ছয়টী :—

(১) অল্প লোকের হাতে ধন সম্পদ জমা হওয়া। তারা সেই সম্পদের জোরে উৎপাদনের সমস্ত জিনিষ নিজেদের আয়ত্তে করে নেয়। যেমন টাটা, বিড়লা এবং ইংলণ্ড আদি। ভারতের সম্পদ পেয়েই ইংলণ্ড ১৮শ শতাব্দীতে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থায় উৎপাদন আরম্ভ কর্‌লো।

(২) জিনিষের চাহিদা বা কাজের চাপের তুলনায় শ্রম (খাটবার লোক) কম হওয়া। এতে অধিক উৎপাদনের জন্য বড় বড় যন্ত্রপাতি লাগানো হয়। আমেরিকার জনসংখ্যার তুলনায় তার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র,

নিবিড় অরণ্যানী, অনেক বিশাল নদ-নদী সহজে আয়ত্তে এনে উৎপাদন বাড়াবার কাজে লাগান যায় না। সেইরূপ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা ছাড়া উপায় নাই। সে ক্ষেত্রে বড় বড় যন্ত্রপাতি বা যন্ত্রশক্তি মারক নয় —পূরক।

(৩) এক একটা নির্দিষ্ট মাপের জিনিষ প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করা। বড় বড় যন্ত্রপাতির দ্বারা মাল উৎপাদন ক'রতে হ'লে মাল প্রচুর পরিমাণে এবং এক একটি নির্দিষ্ট মাপে করার দরকার হয়। তাতে কাজ সহজ হয় এবং মালও সস্তা হয়।

(৪) কোনও নির্দিষ্ট সঞ্চালনে বহু লোককে লাগান। যেমন রুশ দেশ নিজেকে সাম্যবাদী রাষ্ট্রে পরিণত কর্‌বার পরিকল্পনা লওয়ায় তাদের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকেই এই কাজে লাগিয়েছে। এ ক্ষেত্রে তাকে শ্রেণী প্রাধান্যমূলক নয়—একেবারে রাষ্ট্র প্রাধান্যমূলক অর্থব্যবস্থার শরণ নিতে হ'য়েছে।

(৫) বাজার দীর্ঘ ও বড় হওয়া। এতে এক এক কেন্দ্রে উৎপাদন বেশী করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। মাল দূরে পাঠাতে গেলেই কেন্দ্রীয় ব্যবস্থার দরকার হয়।

(৬) যন্ত্র বড় হওয়া, জটিল হওয়া এবং ব্যয়বহুল হওয়া। সাধারণ সকলের পক্ষে এই রকম যন্ত্র যোগাড় করা, রাখা, ব্যবহার করা এবং তা' থেকে যথাযথ ভাবে কাজ আদায় করে সম্পদ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় না। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা দ্বারাই তা সম্ভব হয়।

এতে কয়েকটি কাজের সৃষ্টি হ'ল :—(ক) কাঁচামাল উৎপাদনের জন্য জমির ব্যবস্থা, (খ) কাঁচামাল সংগ্রহ, (গ) পাকামাল উৎপাদন এবং উৎপাদনের জন্য কেন্দ্র স্থাপন, (ঘ) মালের জন্য বাজার সৃষ্টি, (ঙ) দূরস্থ বাজারে মাল প্রেরণের জন্য যান-বাহনাদির আবশ্যক ব্যবস্থা এবং (চ) দূরস্থ বাজারে মাল বিক্রয়।

ফলে আজ কাঁচামালের উৎপাদনের জন্য—

(১) জমির ব্যবস্থায় দেখি এক একটা এলাকায় কোথাও আখ, কোথাও পাট, কোথাও তামাক এবং নারিকেল আদি প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করা হচ্ছে।

(২) কাঁচামাল সংগ্রহের ব্যাপারে দালাল এবং রেল ইত্যাদি যানবাহন ভারে ভারে রাশি রাশি মাল চাষীর ক্ষেত থেকে টেনে আন্‌ছে।

(৩) পাকামাল উৎপাদনে ধনপতি এবং ব্যবস্থাপতিদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বিরাট বিরাট কল কারখানায় সমস্ত দেশ ছেয়ে যাচ্ছে। সমস্ত পৃথিবীতে মাল উৎপাদনের ব্যাপারে একটা হৈ হৈ রৈ রৈ প'ড়ে গেছে।

(৪) পাকামালের বাজার সৃষ্টির জন্য বিজ্ঞাপন, প্রচার, বিভিন্ন রুচি এবং ফ্যাসান সৃষ্টি, দেশ জয় এবং যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই আছে।

(৫) দূরস্থ বাজারে মাল সরবরাহের জন্য একদল দালাল, রেল, ডাক, তার আদি যানবাহন দিনরাত অহরহ দৌড়াদৌড়ি কর্‌ছে।

(৬) মাল বিক্রয়ের জন্য গুদাম, ডিপো, ব্যাঙ্ক আদি কত কিনা সৃষ্টি কর্‌তে হচ্ছে।

আগে নিকটবর্তী বাজারে (short market) যেখানে তেলী চাষীকে তেল দিয়ে ধান নিত, কুমোরকে তেল দিয়ে হাঁড়ি নিত ; তাঁতি তেলীর কাপড় বুনে তেল নিত বা চাষীর কাপড় বুনে ধান নিত, সেখানে উপরোক্ত ছয় প্রকারের কোনটিরই আবশ্যকতা ছিল না। আজ এক একটি কেন্দ্রে উৎপাদন বেশী হ'ল, বাজার দূর হ'ল, ফলে এই ব্যবস্থা একেবারে ভেঙ্গে গেল। এখন গ্রামে গ্রামে মাল উৎপাদন না হ'য়ে কলিকাতার মত বড় বা তার চেয়ে ছোট ছোট কেন্দ্রে মাল

উৎপন্ন হ'তে লাগ্‌ল এবং উৎপন্ন মালগুলি ছোট বড় সহরের মারফত গ্রামে গ্রামে পৌঁছতে লাগল !

এই ভাবে বাজার যত দূরের হ'তে চললো মালও তত দূর থেকে আসতে লাগল। আগে যেখানে মাল স্বগ্রামে, পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে বা গ্রামের অনতিদূরে পাওয়া যেত, আজ সে ক্ষেত্রে মেদিনীপুর, কলিকাতা, বোম্বাই, ইংলণ্ড, আমেরিকা, জাপান, জার্মানী আদি অতি দূরস্থ দেশ থেকে আসতে লাগলো। পৃথিবীর যে দেশ থেকে মাল আনতে হ'ল সেই দেশের জন্য আবশ্যকীয় মাল উৎপাদন করাও দরকার হ'ল। এই ধরণের কাজ আর স্থানীয় গ্রাম্য ব্যবস্থায় করা সম্ভব হ'ল না। তখন গ্রাম ত দূরের কথা প্রদেশকে ছাপিয়ে সমস্ত রাষ্ট্রের জন্য একটা কেন্দ্রীয় ব্যবস্থার দরকার হ'য়ে পড়লো। ক্রমশঃ উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি এবং তার সহচর বড় বড় যুদ্ধাস্ত্র বা মারণাস্ত্রও বেড়ে চললো। তখন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় একে সামলান গেল না। আন্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার দরকার হ'ল। এর চেয়ে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থার চরম পরিণতি আর কি হ'তে পারে? এর চেয়ে বেশী এগোবার আর কোন উপায় নাই। চরম অবস্থায় পৌঁছে পূর্বাবস্থায় বা প্রথমাবস্থায় ফিরে যাওয়াই প্রাকৃতিক নিয়ম। বলা যেতে পারে এই প্রাকৃতিক নিয়ম ধ'রে আবার বিকেন্দ্রীয় ব্যবস্থা আরম্ভ হবে। এর পূর্বাভাষও আমরা স্পষ্ট দেখছি, তাই বোধ হয় গান্ধীজীর মত যুগমানব এ যুগে এই বিকেন্দ্রীকরণের বাণীই শুনিয়ে গেলেন। সে যাই হউক, এই পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদকে অবলম্বন ক'রে পুষ্ট হলো।

সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের অনুগামী বা পুঁজিবাদের পরিপূরক। পুঁজিবাদের অস্তিত্ব কায়েম রাখতে হ'লে অন্যদেশকে নিজের অধীনে রাখতে হয় অথবা প্রভাবের মধ্যে রাখতে হয়। আগে পুঁজিবাদপ্রধান

রাষ্ট্রের নীতি ছিল দেশ দখল বা দেশ জয় করা। বর্তমান জগতে অধীন দেশগুলির মধ্যে স্বাধীনতার ভাবনা জাগার ফলে এখন সেই অধিকার-মূলক নীতির স্থলে প্রভাব-বিস্তারমূলক (influential politics) নীতি অবলম্বন করতে হয়েছে। এখন আর কোনও দেশকে অধীনে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। চেষ্টা চলছে নিজের প্রভাবের মধ্যে রাখতে। এই নিয়ে পৃথিবীর বড় রাষ্ট্র ইংলণ্ড, আমেরিকা এবং রুশের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলেছে। যেমন ভারতকে প্রভাবাধীন রাখার জন্য আগে একদিকে অগাধ পুঁজীর মালিক আমেরিকা ভারতে প্রচুর অর্থ, নানাপ্রকার যন্ত্রপাতি এবং ব্যবস্থাকুশল লোক সরবরাহ করবার জন্য উদ্যত, অন্যদিকে রুশও তেমনি শ্রমিক ও মজুর শ্রেণীর দুঃখ দারিদ্র্যের দোহাই দিয়ে নানা ভাবে ভারতের মধ্যে প্রবেশের জন্য সচেষ্ট। পুঁজিবাদের এই প্রকার সংঘর্ষে পৃথিবী আজ জর্জরিত।

কেন্দ্রীয় অর্থনীতির পরিণাম ঃ—

(১) ব্যক্তিত্বনাশ ঃ—এই ব্যবস্থায় ছোট বড় প্রত্যেক ফার্ম কল-কারখানা, ডিপো গুদাম আদি উৎপাদন এবং বিতরণ কেন্দ্রে তিন শ্রেণীর লোক থাকে। ব্যবস্থাপক, কর্মচারী এবং শ্রমিক, ব্যবস্থাপক শ্রেণীর নির্দেশেই সব কিছু কাজ হয়। তাদেরই প্ল্যান, প্রোগ্রাম, ব্যবস্থা ও চিন্তায় বাকী সকলে যন্ত্রবৎ পরিচালিত হয়। কাজ হিসাবে শ্রমিকদের অনেক বিভাগ থাকে। এক একটা বিভাগের লোক অন্য বিভাগের কাজ সম্বন্ধে হয়ত কিছুই জানে না। জুতার কারখানায় যারা সাইজ করে, তাহা কেবল সাইজই ঠিক করে—কাটে না। যারা কাটে তারা কেবল সাইজ কাটাই জানে। সেলাই-এর সঙ্গে হয়ত তাদের কোন সম্পর্কই থাকে না। ছুঁচের কারখানায় যারা সাইজ ঠিক করে বা ফিনিশ দেয় তারা হয়ত ছাঁদা করায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকে। এই ভাবে যে যার কাজ ছাড়া অন্য

কাজ দেখবার বা জিনিষটীকে সম্পূর্ণরূপে করবার দৃষ্টিভঙ্গিও তাদের আসে না বা অভিজ্ঞতা লাভও সম্ভব হয় না।

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থায় উৎপাদনের ইহাই বৈশিষ্ট্য। কিন্তু অধিক উৎপাদনের এইটাই উৎকৃষ্ট পন্থা। একেই বিশেষীকরণ (specialisation) বলা হয়। এই বিশেষীকরণ শুধু কেন্দ্রীয় ব্যবস্থায় মাল উৎপাদনের ক্ষেত্রে নয় কেন্দ্রীয় ব্যবস্থায় রাজ্যপরিচালনায়ও এই নীতি প্রয়োগ করা হয়। এতে প্রত্যেক অফিসে অনেক বিভাগ থাকে। এক বিভাগের লোক অন্য বিভাগে কোনও খবরই রাখে না।

রুশ দেশের অর্থনীতিক ব্যবস্থা চরম পরিণতি নিয়েছে। সম্প্রতি রুশ প্রত্যাগত জে. সি. কুমারাপ্পা বল্‌ছেন "লোগ্ একদম্ যন্ত্রবৎ হোগয়ে হৈঁ। উন্হেঁ অপনী বুদ্ধিকা উপযোগ করনেকে লিয়ে কোই গুঞ্জাইস নহী রখী গয়ী হৈ। অর্থাৎ রুসিয়োনে জো কুছ্ হাসিল কিয়া হৈ ওহ সরাহনীয় জরুর হৈ লেকিন ইস্‌কে লিয়ে উন্হেঁ লোগোঁমেঁ অন্ধ আজ্ঞা পালনকী আদত ভী ডালনী পড়ী হৈ আউর উন্‌কে বিচার তথা আচারকো এক নিশ্চিত ঢাঁচেমেঁ ঢালনা পড়া হৈ।" (সর্বোদয় জুন ১৯৫২ পৃঃ ১৫৭০)।

কারখানা আদি বড় বড় উৎপাদন কেন্দ্রে যার উপর যে কাজের ভার থাকে, সেই কাজ ছাড়া অন্য কিছু ভাববার তার দরকার হয় না। অনেক ক্ষেত্রে ভাববার অবকাশও থাকে না। মজুরের মত কাজ ক'রেই তাদের ছুটী।

এইরূপ পরিবেশে মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশ সম্ভব হয় না। মানুষের সৃজনীশক্তির (creative instinct এর) বিকাশ রুদ্ধ হয়। আসলে মনুষ্য জীবনের মাধুর্য বলে কোন জিনিষ থাকে না। জীবন একেবারে একঘেয়ে হ'য়ে যায়। এই রকম সমাজে নিরঙ্কুশ সরকারের জন্ম হওয়া স্বাভাবিক। এই রকম সমাজে অনেক ক্ষেত্রে সরকার জনসাধারণের

সেবক না হ'য়ে নির্দয় মালিক হ'য়ে দাঁড়ায়। পুঁজিবাদী প্রথায় হোক বা সাম্যবাদী প্রথায় হোক কেন্দ্রীয় উৎপাদনে ব্যক্তিত্ব নাশের সঙ্গে সঙ্গে জাতির অধঃপতন হয়। কুমারাপ্পাজী বলেছেন :—

"We cannot have a nation of stalwarts on centralised methods. Society is made a fetish of and individuals sink into insignificance (P. 14) Judged from the point of view of its effect on human beings centralised production may be appropriately described as an enslaving practice." (P. 50. "Why Village Movement.")

(২) অন্তর্বৃত্তির বিনাশ :—

কর্মই মানুষের ধর্ম। আসলে তার জীবন অর্থে তার কর্ম। কর্ম ক'রেই সে জীবিত থাকে। কর্মের সার্থকতায় বা ব্যর্থতায় জীবনের সার্থকতা বা ব্যর্থতা নির্ভর করে। অতএব কাউকে কর্মচ্যুত করা মানে তাকে ধর্মচ্যুত করা।

মানুষকে জীবিকা অর্জনের কাজে বেশী সময় দিতে হয়। পূজা পাঠ ইত্যাদিতে সময় কতটুকুই বা যায়? অতএব জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা এমন হওয়া দরকার যাতে মানুষের কর্মচ্যুত বা ধর্মচ্যুত হওয়ার অবকাশ না থাকে।

কাজ এবং আনন্দের সম্বন্ধ বীজ এবং গাছের সম্বন্ধের মত। বীজের ভিতর যেমন গাছ লুকিয়ে থাকে, কাজের ভিতর আনন্দও ঠিক তেমনি। কোন সুস্বাদু ফল সৃষ্টি ক'রে কারই বা না আনন্দ হয়? এইভাবে কাজের আনন্দই নূতন কাজের প্রেরণা দেয়। কাজ এবং আনন্দের এই চক্রই মানব জীবনের স্বাভাবিক গতি। এই গতি রুদ্ধ হলেই জীবিত মানুষও জীবন্মৃত অবস্থায় পর্যবসিত হয়। পুঁজিবাদী কেন্দ্রীয় ব্যবস্থায় বা সাম্যবাদী রাষ্ট্রীয় অর্থ ব্যবস্থায় মানুষ এই প্রকার স্বাভাবিক গতি পায়

না। এক শ্রেণীর লোক যন্ত্রবৎ কাজ করায় এবং আর এক শ্রেণীর লোক যন্ত্রবৎ কাজ করে।

শরীরের পোষণ, রক্ষণ এবং বৃদ্ধির জন্য যেমন খাদ্যের দরকার হয় মানুষের অন্তর্বৃত্তিগুলির পোষণ রক্ষণ এবং বিকাশের জন্যও ঠিক তেমনি দরকার হয় কাজ। জোর ক'রে কাজ করালে বা অনিচ্ছাসত্ত্বে কাজ করলে অথবা কেবল যন্ত্রবৎ রুটিন হিসাবে কাজ করলে মানুষের বিকাশ রুদ্ধ হয়। জীবনে কাজ এবং আনন্দের চক্র চলতে থাকলে মানুষের ধৈর্য, প্রেরণাশক্তি, সৃজনশক্তি এবং মৌলিকতা নিত্য সম্বর্ধিত হ'তে থাকে।

পুঁজিবাদী এবং সাম্যবাদী অর্থ ব্যবস্থায় মানুষের মস্তিষ্ক এবং হৃদয়ের সঙ্গে কাজের কোনও সম্বন্ধ না থাকায় অন্তর্বৃত্তিগুলির যথাযথ বিকাশ সম্ভব হয় না। এক জায়গায় কুমারাপ্পা বলছেন :

"After the Industrial Revolution, Great Britain gained the whole world but lost its soul."

(৩) রাজনীতিক গোলামী :—

আজ অর্থব্যবস্থা এবং রাজ্যব্যবস্থা পরস্পর ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত। বর্তমান অর্থব্যবস্থা কেন্দ্রীয় হওয়ার জন্য রাজ্যব্যবস্থাও কেন্দ্রীয় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। অর্থব্যবস্থা শ্রেণীপ্রধান হউক বা রাষ্ট্রপ্রধান হউক উভয় অবস্থাতে রাজ্য ব্যবস্থা কেন্দ্রীয়ই হয়, কেননা উভয় অবস্থার মৌলিক কোনও পার্থক্য নাই। উভয়ই এক একটী শ্রেণীকে অবলম্বন ক'রে থাকে। শ্রেণীমূলক কেন্দ্রীয় ব্যবস্থায় বা পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বড় বড় ধনপতিরা (বড় বড় ব্যবসায়ী, কলকারখানার মালিক, ফার্মের মালিক, আড়তদার, মহাজন, ব্যাঙ্কার, দালাল ইত্যাদি) রাজ্য ব্যবস্থার শীর্ষে বসে। রাষ্ট্রমূলক কেন্দ্রীয় ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের বা সরকারের ব্যবস্থাপক শ্রেণীর লোকেরা বসে। রাজ্য ব্যবস্থার তিনটি বড় বিভাগ শাসন

(Executive), আইন (Legislative), এবং বিচার (Jndiciary) সমস্তই এই ধনপতি এবং ব্যবস্থাপক শ্রেণীই দখল করে। নির্বাচন তাদেরই ব্যবস্থায় হয়। নির্বাচনে জনহিতকামী লোকের স্থলে স্বভাবতঃ বেশীর ভাগ ধনকামী এবং ব্যবস্থাকামী বা প্রভুত্বকামী লোকেরাই নির্বাচিত হয়। কেন না উভয় ব্যবস্থায় জনসাধারণ ধনপতি বা পুঁজিপতি এবং রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপতিদের আওতায় আসে। তাদের বিরুদ্ধে ব'লবার বা করবার মত সামর্থ্য থাকে না। উভয় ক্ষেত্রে তারা রাজ্যব্যবস্থা কেন্দ্রীয় করেই রাখে। কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিচার, শাসন সব কিছুই এদের হাতে কেন্দ্রীয় রূপ নেয়। অল্প লোকের দ্বারা বহু লোকের ব্যবস্থা ক'রতে গেলেই ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় করা ছাড়া উপায় নাই।

(৪) ফ্যাসন এবং অনাবশ্যক আবশ্যকতার সৃষ্টি :—

ছোট বড় যন্ত্রগুলিকে পুষ্ট রাখা এবং যন্ত্রজাত জিনিষ বাজারে অব্যাহত রাখার জন্য নিত্য-নূতন আবশ্যকতার সৃষ্টি হচ্ছে। বেশ ভূষায় কত রং বেরং-এর কাপড় চোপড় কত আধুনিক ধরণের জামা, সার্ট, কামিজ, কোর্ট, প্যাণ্ট ইত্যাদি। খাদ্য দ্রব্যে—কত রকমের লজেন্স, কেক, বিস্কুট, চা, কাফী, বিড়ি, সিগারেট ; গৃহ সরঞ্জামে—কত রকমের চেয়ার, টেবিল, আলনা, বাটী, গ্লাস, কাপ, কেট্‌লী ; বিলাস দ্রব্যে—কতরকমের সাবান, আতর, এসেন্স, ছড়ি, ঘড়ি, ফাউণ্টেনপেন, টর্চ্চ ইত্যাদি। ছেলেদের খেলনায় রকমারির সীমা নাই। ছুরি, কাঁচি, ক্ষুর, বাটালী, করাত থেকে আরম্ভ ক'রে ধান ভানা কল, আটা পিষা কল, এবং বড় বড় এঞ্জিন পর্যন্ত নানা রূপ নিয়ে আমাদের সামনে আসছে। এই দৃষ্টি নিয়ে আজ ছোট বড় যে কোনও সহরে প্রবেশ করলে চোখ ঝলসে যাবে। প্রত্যেকটী জিনিষ আমাদিগকে রূপে রসে গন্ধে স্পর্শে প্রতিনিয়তই আকৃষ্ট করছে। আজ যে ফ্যাসান বা যে জিনিষ নূতন বা আধুনিক ব'লে সমাদরে গৃহীত হচ্ছে দু'দিন পরে সেগুলি অতি

পুরাতন এবং অব্যবহার্য ব'লে পরিত্যক্ত হচ্ছে। পুঁজিপতিরা আবার নূতন জিনিষ এনে বাজার ভরে দেয় এইভাবে পুঁজিপতি শ্রেণী সদাপুষ্ট থাকে।

(৫) অনাবশ্যক আবশ্যকতার ফল :—

অনাবশ্যক আবশ্যকতার জন্য কাঁচামাল উৎপাদনে খাদ্যশস্যের অনেক জমি মুদ্রাশস্যে আবদ্ধ হয়।

দ্বিতীয়তঃ নানা প্রকার জিনিষের জন্য নানা প্রকার কলকারখানা স্থাপন করতে হয়: এই ভাবে আজ বিড়ি, সিগারেট ফ্যাক্টরী ; গ্লাস, সাবান, কাপ, কেটলী ইত্যাদি নানাপ্রকার ফ্যাক্টরী স্থাপিত হয়েছে এবং নিত্য-নিত্য আরও কত হ'তে চলেছে। নিত্য-নূতন ফ্যাক্টরীর সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাক্টরীজাত জিনিষে সহরের দোকান ভ'রে যাচ্ছে। ক্রমশঃ সহরের আকার বেড়ে চলেছে। লোকে গ্রাম ছেড়ে সহরের দিকে দ্রুত ধাবিত হচ্ছে। ফ্যাক্টরীজাত জিনিষের গ্রাহক সংখ্যা বাড়ায় দোকানের সংখ্যাও বেড়ে চলেছে। গ্রামে গ্রামে দোকান বসে যাচ্ছে। এই ভাবে বড় বড় যন্ত্রপাতি সমস্ত দেশকে নিজের করাল কবলে টেনে নিচ্ছে।

(৬) উৎপাদন এবং বিতরণে শ্রম-শক্তির অপচয় :—

দেশের হাজার হাজার লোককে এই সমস্ত অনাবশ্যক জিনিষ উৎপাদনের জন্য শত শত কলকারখানায় লাগ্‌তে হয়। তা' ছাড়া এই গুলির কাঁচামাল উৎপাদনের জন্য জমিতে ; জিনিষগুলির সরবরাহের ব্যাপারে—রাস্তা ঘাট এবং যানবাহন তৈরীতে ; রাস্তাঘাট তৈরীর জিনিষ পত্রে, ডিপো, গুদাম আদিতে অর্থ এবং শ্রম উভয়ই প্রচুর পরিমাণে ব্যয়িত হয়। এর সঙ্গে কারখানাজাত মাল উপভোক্তা পর্য্যন্ত পৌছাবার জন্য মধ্যবর্তী লোক হিসাবে অনেককে ব্যবসায়ী এবং দালাল সাজতে হয়। তাদের জন্য চাই অফিস আদালত

ইত্যাদি। এই সমস্ত অনাবশ্যক কাজে রাষ্ট্রের অনেক শক্তি ও সম্পত্তির অপচয় হয়।

(৭) শ্রমবিমুখতা এবং আলস্যজনিত পরভোজীবৃত্তির প্রাধান্য :—

প্রকৃত পক্ষে জন সম্পদ বা শ্রম সম্পদই উচ্চস্তরের মূলধন। উৎপাদন ব্যাপারে এর দ্বারাই যন্ত্রপাতি আদি অন্য মূলধনের সৃষ্টি হয় এবং কার্য্যকরীও হয়। এর সাহায্য ব্যতীত অন্য সব মূলধন অচল এবং নিষ্ক্রিয়। ভারতে এই সম্পদের যথেষ্ট প্রাচুর্য্য। খাটবার বা কাজ কর্‌বার লোক প্রচুর। এত লোক থাকা সত্ত্বেও মাল উৎপাদনে বৃহৎ বৃহৎ যন্ত্র ব্যবহৃত হওয়ায় শ্রমের অব্যবহার এবং অপব্যবহার হচ্ছে। অব্যবহার এই হিসাবে যে লোকে কাজ পাচ্ছে না এবং অপব্যবহার এই হিসাবে যে অল্পশ্রম বহু শ্রমকে বেকার ক'রে দিচ্ছে। ছোট-খাট প্রত্যেকটী জিনিষে এমন যন্ত্র ব্যবহৃত হচ্ছে যাতে অন্য লোকের হাতে কাজ থাকৃছে না। যন্ত্রই ছোট বড় সব কাজ করে দিচ্ছে। ফলে যন্ত্রের উপর নির্ভরতাও ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে। শারীরিক শ্রমে রুচি এবং অভ্যাস ক্রমশ ক'মে যাচ্ছে। আগে সহযোগমূলক বা স্বয়ংপূর্ণতামূলক বিকেন্দ্রীত অর্থব্যবস্থায় যেখানে লোকের বৃত্তি শ্রমমূলক এবং জাতির মৌলিক আবশ্যকতার পরিপূরক ছিল এখন সে স্থলে ঠিক তার বিপরীত বৃত্তির দিকে লোকে হু হু ক'রে দৌড়ে চলেছে। এই সমস্যা সমাধানের একটা বিফল চেষ্টা চলেছে পরিকল্পিত অর্থনীতির (planned economy) ধুয়া দিয়ে। বড় বড় অর্থশাস্ত্রবিদরা পরিকল্পিত অর্থনীতির (planned economy) সূত্র বে'র করছেন। পঞ্চবার্ষিক বা দশম বার্ষিক যোজনা করছেন কিন্তু অর্থ ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় থাকার দরুন কোনও সূত্র, কোনও যোজনা কার্যকরী হ'তে পারছে না। অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে অনেক অর্থ ব্যয় ক'রে অনেক বড় বড় অর্থশাস্ত্রবিদদের দিয়ে আমাদের সরকার পঞ্চবার্ষিক যোজনা

করলেন, কাজে নেমে এখন বলতে আরম্ভ করেছেন এ পথে বেকার সমস্যার সমাধান হওয়া অসম্ভব।

প্রধান প্রধান পরভোজী বৃত্তিগুলি এই :—(১) ডাক্তারী, (২) আইনজীবি, (৩) শিক্ষকতা, (৪) ব্যবসায়, (৫) চাকুরী (সরকারী এবং বেসরকারী)।

এগুলি পরভোজীবৃত্তি। যে সমাজে জীবিকানির্বাহ ব্যাপারে শরীর শ্রমের সুযোগ কম থাকে বা শরীর শ্রমকে কম গুরুত্ব দেওয়া হয় সেইখানেই পরভোজীবৃত্তির জন্ম হয়। যে অর্থনীতি এই পরভোজীবৃত্তি যত কম করতে পারে সেইটা ততই জনসুখকর হয়।

আমাদের বর্তমান অর্থনীতি পরভোজীবৃত্তিপ্রধান। চাকুরী-জীবির সংখ্যা বহুগুণ বেড়েছে। মন্ত্রীর সংখ্যা দ্বিগুণ ত্রিগুণ বেড়ে চলেছে। সরকারী বেসরকারী সমস্ত অফিসে কর্মচারী ভরপুর।

গ্রামে গ্রামে ডাক্তার, ঘরে ঘরে প্রাইভেট টিউটার, হাটে বাটে এই পরভোজী লোকের ভিড়।

এই ভাবে শ্রম-বিমুখতামূলক বৃত্তির দিকে সমস্ত সমাজ আজ ঝুঁকে পড়েছে। মৌলিক আবশ্যকতার পরিপূরক বৃত্তি থেকে লোক ক্রমশঃ দূরে স'রে যাচ্ছে। শারীরিক শ্রমে জাতির রুচি এবং অভ্যাস ক্রমে কমে আজ এমন চরম সীমানায় পৌঁছেছে যে আজ ইচ্ছা করলেও অনেকে শারীরিক শ্রম করতে পারছে না। এই শ্রমবিমুখতা থেকে পরনির্ভরতা বাড়ছে। জাতির স্বাবলম্বন ভাবনা ক্রমে লোপ পাচ্ছে। ফলে সমাজে পরভোজীবৃত্তিধারীদের সংখ্যা এত বেশী হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

(৮) বেকারী :—

মানব শ্রমের প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও যন্ত্রের ব্যবহার হ'লে স্বভাবতঃই বেকারীর সৃষ্টি হয়। আজ বৈজ্ঞানিক যুগে এমন সব যন্ত্রের আবিষ্কার হয়েছে যার দ্বারা অল্প লোকে এক একটি যন্ত্র চালিয়ে শত শত লোককে

বেকার ক'রে দিচ্ছে। ফলে যে সমস্ত শিল্প তাদের জীবিকা নির্বাহের অবলম্বন ছিল সেগুলিও লোপ পাচ্ছে।

নিম্নলিখিত উদাহরণ থেকে এই বিষয়ের স্পষ্ট ধারণা করা যায় :—

যন্ত্রপাতি এবং কারখানা	বিনষ্ট শিল্প	শিল্পী
১। সূতার কল	চরকা	দেশের আবালবৃদ্ধ-বণিতা
২। কাপড়ের কল	তাঁত	তাঁতি
৩। আটা কল	যাঁতা	বিশেষ করে স্ত্রীজাতি
৪। ডালভাঙ্গা কল	যাঁতা	" " "
৫। তৈল কল	ঘানি	তেলী
৬। রাইস মিল বাণী মিল	(১) ঢেঁকি	বিশেষ করে স্ত্রীজাতি
	(২) বাঁশ	ডোম
৭। চিনির কল (সুগার মিল)	গুড়, আখমাড়ান কল	গুড় প্রস্তুতকারী
৮। জুতার কারখানা	চর্মশিল্প	চামার, মুচি
৯। জুট মিল	বস্তা, আখা	বস্তা, আখা, দড়ি ইত্যাদি প্রস্তুতকারী
১০। এ্যালুমিনিয়ম, গ্লাস (কাচ) এনামেল এবং টিনের কারখানা	(১) মৃৎ শিল্প	কুমোর
	(২) পিতল ও কাঁসা	কাঁসারী
	(৩) ঘর তৈরী	ঘরামী (গৃহ নির্মাণ শিল্পী
১১। লোহার কারখানা	কামার	কামার
১২। কাঠের কারখানা	ছুতারী	ছুতোর
১৩। কম্বলের কারখানা		কম্বল প্রস্তুতকারী
১৪। কালি-কলম তৈরীর কারখানা		অভিভাবক, শিক্ষক ছাত্র

১৫। সূতা এবং দড়ি পাকাবার কল — জেলে এবং আবালবৃদ্ধ বণিতা

১৬। বড় বড় ঔষধের কারখানা — প্রাকৃতিক চিকিৎসা এবং কবিরাজী উভয়ই

১৭। জল সেচের পাম্পিং মেশিন — সেচনী — ডোম, অন্য শ্রমিক

কোনও কোনও ক্ষেত্রে কৃষির জলসেচের জন্য পাম্পিং মেশিন দরকার হয় বটে কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহা উপরোক্ত যন্ত্রগুলির সমপর্যায়ভুক্ত।

নিত্য নূতন আবশ্যকতার সৃষ্টি করে বেকার সমস্যার সমাধান :—

এক শ্রেণীর লোক আছেন যারা বলেন নিত্য নূতন আবশ্যকতার সৃষ্টি ক'রে এবং সেই আবশ্যকতা পূরণের জন্য নিত্য নূতন যন্ত্রপাতি ও কল কারখানা চালু ক'রে বেকার সমস্যার সমাধান করা যায়।

কিন্তু এ পর্যন্ত দেখা গেছে এক একটি যন্ত্র বা এক একটি কারখানা হাজার হাজার লোকের হাত থেকে কাজ ছাড়িয়ে নিচ্ছে এবং তার পরিবর্তে অনেক নূতন নূতন যন্ত্র আবিষ্কার ক'রে কল কারখানা ব্যবসায় আদিতে কিছু লোক নিযুক্ত করছে। এই পন্থায় যত লোককে কাজ দেওয়া যায়, তার চেয়ে অনেক অধিক সংখ্যককে বেকার করাই স্বাভাবিক। তা ছাড়া আবহমান কাল ধ'রে বাসনা তৃপ্তির জন্য নিত্য নূতন যন্ত্রপাতির আবিষ্কার এবং নূতন নূতন অভাব সৃষ্টি কখনই মানব জীবনের লক্ষ্য হ'তে পারে না। কেননা বাসনাকে পরিতৃপ্ত করা যায় না। আগুনে ঘি দেওয়ার মত তা বেড়েই চলে। লাভের মধ্যে লোকের পেট কেটে আবশ্যকীয় কাঁচামালের আহুতি দিতে হয়। বেকারি বেড়েই চলে। দারিদ্র্যের জ্বালায় মানব জর্জরিত হয়।

ব্যবহারিক দৃষ্টিতে দেখলেও আমরা এই পথ অবলম্বন করতে পারি

না। কেননা নূতন নূতন আবশ্যকতার সৃষ্টি মানে নূতন নূতন ব্যয়ের উদ্ভাবন। আবশ্যকতা বাড়লে ব্যয় বাড়াও স্বাভাবিক। ব্যয়ের অনুপাতে আয়ের ব্যবস্থা করতে না পারলে দেউলিয়া হ'তে হয়। বেশ স্পষ্ট দেখা যায় এই অর্থব্যবস্থায় আমাদের অধিকাংশ লোকের ব্যয়ের খাতা বেড়েই চলেছে এবং অল্প সংখ্যক এক শ্রেণীর লোক—যাদের হাতে যন্ত্রপাতি আদি উৎপাদনের সামগ্রী যত বেশী—তাদের আয়ের খাতায় তত বেশী জমা হচ্ছে।

আমাদের অধিকাংশের আয়ের ঘরে কম পড়বার অন্য কারণ এই যে কোন আয়ের কথা হ'লেই যন্ত্র সেখানে দৌড়ে আসে। যন্ত্রের দৌড়ে আসা মানে অল্পসংখ্যক যন্ত্রপাতি বা পুঁজিপতির থলি ভরা এবং বহুসংখ্যক লোকের ব্যয়ের খাতা বাড়ানো ও বেকার ক'রে দেওয়া। আগুনের দ্বারা আগুন নিভান বা চোরের দ্বারা চৌর্যবৃত্তির নিবারণ যেমন অসম্ভব—যদিও পুঁজিবাদী ইংরাজদের কথামত 'চোর ধরবার জন্য চোর বহাল কর (engage a thief to catch a thief) —নিত্য নূতন বাসনার সৃষ্টি ক'রে যন্ত্রের দ্বারা বেকার সমস্যার সমাধানও তেমনি।

(৯) জীবনধারণের মান উচ্চ করা :—

পুঁজিপতিরা নিজেদের পুঁজিবাদ কায়েম রাখবার জন্য ও নিজেদের যন্ত্রজাত জিনিষের বাজার চালু রাখবার জন্য নানা রকমের জিনিষ আবিষ্কার ক'রে বলেন মানুষের জীবনধারণের মান উচ্চ হওয়া দরকার —যদিও তাদের মতে মানুষ মানে তাদেরই মত কতিপয় ধনী লোক। তাঁরা বড় বড় পণ্ডিতের দ্বারা এই ধরণের সাহিত্য লেখান। তাঁরা বসন ভূষণ, ভোজন, আবাগমন, লেখাপড়া, কাজকর্ম, ঘর-দুয়ার, রাস্তা-ঘাট আদি সম্বন্ধে নূতন নূতন ধারার প্রচলন করেন। বর্তমান সমাজে শ্রম বিমুখতার আবহাওয়া তাঁদেরই সৃষ্টি।

প্রথমতঃ, এর দ্বারা মানুষ তার জীবনের লক্ষ্য থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে যায়। দ্বিতীয়তঃ এই ভৌতিক সুখের পিছনে দৌড়ে কোন দিনই সুখের নাগাল পায় না। তৃতীয়তঃ এর দ্বারা বেণিয়া বা পুঁজিপতিরাই পুষ্ট হয়।

আবশ্যকতা বৃদ্ধির পরিণাম—সময়ের অপচয়।

প্রত্যেকটী আবশ্যকতার জন্য প্রধানতঃ নিম্নপ্রকারে সময় ব্যয়িত হয় :—

(১) উপার্জন, (২) আনয়ন, (৩) ব্যবহারের উপযোগীকরণ, (৪) সংরক্ষণ, (৫) ক্ষয় নিবারণ ও মেরামত এবং (৬) উপভোগআদি। আবশ্যকতার প্রকার ও পরিমাণ যত বেশী হয় এই সমস্ত কাজে তত বেশী সময় লাগে। যেমন বেশী কাপড় চোপড় ব্যবহার করলে কিনবার জন্য কর্তে হবে বেশী আয়। তাকে আন্তে হবে বাজার থেকে। তাকে পরবার উপযোগী করবার জন্য—রং করা, জামা কোট ইত্যাদির জন্য কাটাকাটি ও সেলাই ত' আছেই। তা' ছাড়া সেগুলি সুরক্ষিত রাখা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, শুকান, উঠান, গুছান, সাবান দেওয়া ইত্যাদি কত কিনা! এইভাবে কাপড় যত বেশী হবে বা অন্য যে কোন জিনিষ যত বেশী হবে এই প্রকার কাজে সময় তত বেশী যাবেই। এই ভাবে ভৌতিক উৎকর্ষের পরিবেশে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষসাধন কি করেই বা সম্ভব হতে পারে?

সাধারণতঃ লোকে বলে যন্ত্রের দ্বারা উৎপাদনে সময় খরচ কম হয়। কিন্তু আসলে তা' নয়। রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিতে এই অর্থনীতির গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত হিসাব করলে দেখা যাবে সময় বাঁচা ত দূরের কথা বরং অনেক অধিক লাগে। মনে করুন একটি দেশের এক কোটী সরল অনাড়ম্বর লোক যারা জীবন যাপনের জন্য যতদূর সম্ভব কম যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে—সেক্ষেত্রে জীবন যাপন ব্যাপারে তাদের মোট সময় যত

লাগে সেই রকম একটী দেশের আড়ম্বরপূর্ণ বাবু লোক যারা জীবন-যাপন ব্যাপারে যতদূর সম্ভব বেশী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে, হিসাব করলে দেখা যাবে ছোট বড় প্রত্যেক কাজে যন্ত্র-ব্যবহৃত দেশের জীবন যাপন ব্যাপারে সময়ের ব্যয় তার চেয়ে অনেক বেশী।

দেখা যাচ্ছে আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি যেন আর পেরে উঠ্ছে না। উৎপাদনে হুড়োহুড়ি, বিতরণে হুড়োহুড়ি। গ্রামে অভাব পুরছে না—সহরে দৌড়াচ্ছে। হেঁটে পারছে না—সাইকেলে, মোটরে, রেলে, উড়োজাহাজে ছুটেছে। বিশাল পৃথিবীকে এতটুকু ছোট্ট ক'রে ফেলেছে। সর্বত্রই হুড়োহুড়ি-দৌড়াদৌড়ি, তবুও না কারও ফুরসুৎ আর না কারও শান্তিতে পেট পালনের অবসর। অর্থাৎ এই যন্ত্রযুগের দৌলতে মানুষের আরামে প্রাণ রাখ্বার চেষ্টায় প্রাণান্ত হ'য়ে উঠছে।

পৃথিবীর ইতিহাস অধ্যয়ন করলে দেখা যায় আবশ্যকতার বৃদ্ধি ক'রেই বড় বড় সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়েছে।

(১০) প্যাকিং—কেন্দ্রীয় অর্থনীতিতে প্যাকিং অত্যন্ত আবশ্যকীয় জিনিষ। এই অর্থ ব্যবস্থায় বাজার অত্যন্ত দীর্ঘ হ'য়ে গেছে। দূরস্থ বাজারে মাল পাঠাতে হ'লে প্যাকিং ছাড়া গত্যন্তর নাই। এই কাজে আঁশ জাতীয় জিনিষ যেমন পাট, শণ তূলা, নারিকেল দড়ি, বাবুই দড়ি ইত্যাদি; টিন এবং টিন জাতীয় প্যাকিং উপযোগী ধাতু; কাগজ কাঁচ এবং কাঠই বেশী উপযোগী। এইগুলি দিয়ে দড়ি, বস্তা, বাক্স, ট্রাঙ্ক, শিশি বোতল এবং কাঠের বাক্স আদি প্যাকিং-এর জন্য ব্যবহৃত বস্তু প্রস্তুত হয়। এই জন্য দরকার হয় বড় বড় জুট মিল, কাচ এবং কাঁচের শিশি বোতল ইত্যাদি তৈয়ারীর কারখানা, ট্রাঙ্ক—বাক্স আদি তৈরীর কারখানা এবং আরও নানারকম।

এই কারখানাগুলির জন্য চাই কাঁচামাল। এমন অনেক কাঁচামাল

আছে যেগুলি খাদ্যশস্যের জমিতে উৎপন্ন হয়, যেমন পাট, নারিকেল, তামাক ইত্যাদি। পয়সার লোভে আজকাল লোকে খাদ্য-শস্য উৎপাদন বন্ধ ক'রে পাট, তামাক, নারিকেল আদি প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করছে। ফলে খাদ্য-শস্য উৎপাদন কম হচ্ছে।

মোটর, ট্রাঙ্ক, নৌকা, জাহাজ, রেল ইত্যাদিতে ত' প্রচুর পরিমাণে কাঠ লাগে। তা' ছাড়া প্যাকিং-এর জন্যও প্রচুর কাঠ খরচ হয়। এই জন্য অনেক বন-জঙ্গল ধ্বংস করতে হয়। বন-জঙ্গল ধ্বংস হওয়ার জন্য দেশে যথাসময়ে বারিপাত হয় না। যা হয় তা'ও অনেক ক্ষেত্রে বন্যার সৃষ্টি করে। কখনও অতিবৃষ্টি কখনও অনাবৃষ্টি হয়। এই সমস্ত আপদ থেকে বাঁচবার জন্য সরকারকে একটা বিরাট বনবিভাগ খুলে অনেক কর্মচারী পাল্‌তে হয়—যারা দেশে বন-সৃষ্টির বাণী প্রচার করেন এবং দিল্লী, কলিকাতা আদি বড় বড় সহরের বিশাল অট্টালিকার প্রাঙ্গনেও অতি সমারোহে বৃক্ষরোপণ উৎসব উদ্‌যাপন করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অধিক শস্য ফলাও বিভাগ খুলে বড় বড় জঙ্গল কেটে বিদেশী ট্রাক্‌টরের দ্বারা মাঠ তৈরীর পরিকল্পনাও করেন।

কেন্দ্রীয় অর্থনীতিতে এই প্রকার বিষচক্র চল্‌তে থাকে। এই অর্থনীতিকে আমরা ঘরে আগুন লাগিয়ে আগুন নিভাবার পদ্ধতি বল্‌তে পারি। যেমন আজকালকার পুঁজিপতিরা যুদ্ধ সমাপ্তির জন্য যুদ্ধ (waiging war to end war) চালাবার কথা বলেন—এই নীতিতে আমাদের ক্ষতি ছাড়া লাভ হ'তে পারে কি না বুঝা অতীব সহজ।

(১১) রাষ্ট্রীয় ব্যয় :—কোনও জিনিষের উৎপাদনে রাষ্ট্রীয় আয় এবং রাষ্ট্রীয় ব্যয় উভয় দিক লক্ষ্য করেই রাষ্ট্রীয় অর্থব্যবস্থা কেন্দ্রীয় অথবা বিকেন্দ্রীয় কর্‌তে হয। কেন না, রাষ্ট্রের জনগণই উৎপন্ন মালের উপভোক্তা। সেই উপভোক্তাদের উপর যাতে খরচ কম পড়ে

এবং অনাবশ্যক না হয় সে বিষয়ে নজর রাখা রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির প্রধান কাজ।

খরচ কম বা বেশী নির্ণয় করতে হলে উপভোগ্য জিনিষের প্রকৃতি জানা দরকার। যে ক্ষেত্রে সমস্ত জিনিষ উপভোক্তারা স্ব স্ব ব্যবস্থায়, স্ব স্ব চেষ্টায় সরল এবং সহজলভ্য যন্ত্রপাতির দ্বারা যানবাহন, রাস্তাঘাট, প্রচার আদির জটিলতা থেকে মুক্ত হ'য়ে সহজভাবে পরস্পর আদান-প্রদানে ক'রে নিতে পারে সে ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থায় উৎপাদন নীতিকে আমরা দেউলিয়া অর্থনীতি বল্‌তে পারি। লোহা উৎপাদনের কারখানা ঘরে ঘরে করা যেমন ব্যয়বহুল বা দেউলিয়া অর্থনীতি, কাপড়-চোপড় প্রভৃতি জিনিষের জন্য বড় বড় কলকারখানা করাও তেমনি দেউলিয়া অর্থনীতি। আমাদের বর্তমান অর্থনীতি দেউলিয়া নয় কি ?

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থায় বড় বড় যন্ত্রপাতির দ্বারা উৎপাদনের হিসাব ধরলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় মালের দাম খুব সস্তা, কিন্তু এই পদ্ধতির পরিণাম বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এইটাই সর্বাপেক্ষা ব্যয়বহুল পদ্ধতি। এই পদ্ধতি অনেককে বেকার ক'রে খেতে না দিয়ে মেরে তাদের বৃত্তি কেড়ে নিয়ে কারখানায় জিনিষ উৎপাদন করে। সেই সমস্ত বেকারের বোঝা যদি মিলের উপর ফেলা হয় তা হলে মিলে তৈরী জিনিষ কখনও সস্তা হতে পারে না। অত্যধিক চড়া হয়।

(১) প্রথমেই যুদ্ধের কথা ধরা যাক্। এই অর্থব্যবস্থায় যুদ্ধ অনিবার্য। কারণ বড় বড় যন্ত্রপাতির জন্য উৎপাদন বহুল পরিমাণে করতে হয়। তা না হ'লে খরচ পোষায় না বা লাভও হয় না। উৎপাদন বেশী হ'লে বিক্রীর জন্য চাই বাজার। বাজার সহজে হয় না। তার জন্য করতে হয় দেশ জয়, যুদ্ধবিগ্রহ ছাড়া ত দেশ জয় করা যায় না ? আজ সমস্ত পৃথিবী যুদ্ধক্লান্ত—ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত। জনসম্পদ, ধনসম্পদ

এবং সব চেয়ে বড় আমাদের নৈতিক-সম্পদের যে হানি হচ্ছে তা অপূরণীয়।

ধন সম্পদ হানির কথা শুন্‌লে গা শিউরে উঠে। এক একটা যুদ্ধ জাহাজের দামই প্রায় ১৪।১৫ কোটী টাকা। আমাদের সরকার যেখানে এত বড় একটা বিরাট জনবহুল দেশে শিক্ষার জন্য টেনেটুনে হয়ত ১০।১২ কোটী টাকা খরচ করেন তাকে যদি এক একটা যুদ্ধ জাহাজের জন্য ১৪।১৫ কোটী টাকা ব্যয় করতে হয় তা' হ'লে আমরা আসলে দেউলিয়া নয় কি? এক একটা কামানের দাম হয়ত ৫।৬ লক্ষ টাকা। কত কামানই না রাখ্‌তে হয়! এক একটা কামানের খরচে আমাদের এক একটা বড় বড় জনহিতকর প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে চালান যেতে পারে। এক একটা কামানের টাকা। দিয়ে আমরা শিক্ষা-শিল্প—কৃষি আদি দেশোন্নয়নমূলক কাজ এবং দুর্ভিক্ষ নিবারণ আদি মানবরক্ষামূলক কত কাজই না করতে পারি!

এই যুদ্ধের জন্যই অনেক সময় শত শত বিঘা জমির তূলা, প্রভূত খাদ্য-শস্য এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় জিনিষ জ্বালিয়ে ফেলতে হয়। গত দ্বিতীয় মহাসমরে ঘরপোড়া অর্থনীতি কি ধ্বংসলীলাই না করেছে! দেশের সম্পদ লাভ ক'রে পাছে শত্রুপক্ষের শক্তি-বৃদ্ধি হয়—এই জন্য নির্মমভাবে সমস্ত সম্পদ জ্বালিয়ে ছাই ক'রে দিয়েছে!

(২) বহুল উৎপাদন (Large scale production) এবং বিতরণ ব্যাপারে ব্যবসায়ীদের চালে প'ড়ে কৃষকেরা কখনও কখনও শত শত বিঘা আখ, পাট, তূলা, ইত্যাদি পুড়িয়ে ফেলতে বাধ্য হয়।

(৩) যুদ্ধে নাইট্রোজেন গ্যাস প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। এই নাইট্রোজেন উদ্ভিদের উৎকৃষ্ট আহার। এ থেকে সার তৈরী হয়। দেশের প্রভূত অমূল্য সম্পদ এইভাবে অযথা নষ্ট হয়।

(৪) সর্বোপরি এই সকল অনর্থ সৃষ্টির কাজে মানুষের মত শ্রেষ্ঠ

জীবের লেগে থাকা যে কত হানিকর মুদ্রামুল্যে তা' হিসাব করা যায় না।

(৬) বহুল উৎপাদনের হিসাব রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিতে বিচার করলে প্রধানত: তিন রকমের ক্ষতি নজরে আসবে। যথা :—

(ক) আর্থিক ক্ষতি :—খাঁটি জিনিষ পাওয়া যায় না। নকল এবং কম টেকসই জিনিষে বাজারে ভ'রে যায়। জিনিষ খুব সস্তায় পাওয়া যায়। কিন্তু আসলে সস্তা নয়। এ্যালুমিনিয়মের বাসন, গাটাপার্চার চিরুনী, আয়না আদি প্রায় সব জিনিষই খুব সস্তা বটে কিন্তু টেকসই না হওয়ার জন্য আসলে খরচ বেশীই পড়ে। যেমন বাজারে খারাপ মুদ্রা এলে ভাল মুদ্রার মুখ দেখা যায় না তেমনি কম টিকাউ (কম টেকসই) এবং চাকচিক্যপূর্ণ জিনিষ বাজারে এলে ভাল জিনিষ লুকিয়ে যায়। এ্যালুমিনিয়মজাত কম টিকাউ জিনিষ বাজারে এসে কাঁসা পিতলকে একেবারে সরিয়ে দিয়েছে। এই রকম জিনিষের ব্যবহারে উপভোক্তাদের আর্থিক ক্ষতি-ত হয়ই তা ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে শারীরিক ক্ষতিও হয়। কলের তেল, কলছাঁটাই চাল, কলে-পিষা আটা ইত্যাদির দ্বারা যে শারিরিক ক্ষতি হয় এতে কারও কোন সন্দেহ আছে কি?

(খ) নৈতিক ক্ষতি :—উপভোক্তা এবং উৎপাদকের সঙ্গে কোনও প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ না থাকায় উৎপাদকেরা মালে ভেজাল দেয় বা নকল মাল সৃষ্টি করে। আজ তেলীর তেলে ভেজাল, গোয়ালার দুধে ভেজাল, সর্বত্র ভেজালই ভেজাল। এই অর্থব্যবস্থায় ভেজালের অবকাশ এত বেশী থাকে যে মানুষ নৈতিক স্তর থেকে অনেক নীচে নেমে যায়। জাতির নৈতিক অধঃপতনের এটাও একটা বড় কারণ।

(গ) কাঁচামালের অপব্যয় :—উৎপাদন সম্পদগুলির ব্যবহারে খরচ বেশী পড়ে এবং সম্পদগুলি অনর্থক নষ্ট হয়। যেমন বড় বড় পেপার মিলের জন্য প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাঁশবন রাখতে হয়। কারণ সদ্য-কাটা বাঁশ

থেকেই বড় বড কারখানায় কাগজ তৈরী করা সহজ কিন্তু কুটীর শিল্প প্রথায় কাগজ তৈরীতে বাঁশের ব্যবহৃত পুরাতন জিনিষ থেকেও ভাল কাগজ করা যায়।

(১২) বিজ্ঞাপন ও প্রচার :—কেন্দ্রীয় ব্যবস্থায়—বিশেষ ক'রে পুঁজিবাদী প্রথায়—বিজ্ঞাপন এবং প্রচার একটা বড় জিনিষ। এই কাজের জন্য অনেক খবর-কাগজ, পুস্তক-পুস্তিকা ইত্যাদি লিখ্‌তে এবং ছাপ্‌তে হয়। লেখায় প্রকাশনে এবং প্রচারে অনেক লোককে লাগ্‌তে হয়। এতে রাষ্ট্রের জনশক্তির অনেক অপচয় হয়। জিনিষ বিক্রীর জন্য প্রতিযোগিতা না থাকলে এত প্রচারের আবশ্যকতাই হ'ত না। কিন্তু পুঁজিবাদী কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা এবং প্রতিযোগিতা দু'টী পরস্পরের পরিপূরক। এই প্রতিযোগিতার জন্য প্রচার এবং প্রচারের জন্য রাষ্ট্রের যে জন-শক্তি লাগে তার দ্বারা রাষ্ট্রগঠনমূলক কোনও ভাল কাজ করা যেতে পারতো।

প্রত্যেকেই প্রচারের জন্য যথেষ্ট মিথ্যার আশ্রয় নেয়। যে জিনিষের বাজার সৃষ্টি করবার কথা তার গুণ যদি '১' হয় লোকের মাঝে বাড়িয়ে, '১০০' ক'রে প্রচার করে। সে জিনিষ যদি একটী কাজের উপযোগী হয় তাকে সর্বগুণসম্পন্ন ব'লে লোকসমক্ষে ধরে। যারা মিথ্যা বলবার কৌশল জানে বা যারা অতিরঞ্জিত ভাষায় লিখিতে পটু তারাই প্রচার এবং বিজ্ঞাপন লেখার কাজে লাগে। বিজ্ঞাপনী ভাষার একটা বৈশিষ্ট্য থাকে। এই কাজে জাতির একটা অংশ বেশ মিথ্যার অনুশীলন করে।

খবর কাগজ, পুস্তিকা, বিজ্ঞাপন ইত্যাদিতে প্রচুর কাগজ লাগে। এই কাগজ প্রধানতঃ বাঁশ এবং ঘাস থেকেই হয়। কাজেই আমাদের খাদ্যশস্যের অনেক জমি বাঁশ এবং ঘাস দখল ক'রে বসে। খাদ্যাভাবের এও একটী কারণ নয় কি?

(১৩) শ্রমিক আন্দোলন :—বিকেন্দ্রীত অর্থব্যবস্থায় শ্রমিক সমস্যার কোনও বালাই নাই। কিন্তু পুঁজিবাদী-কেন্দ্রীয়-ব্যবস্থায়-উৎপাদন হ'লেই শ্রমিক সমস্যা এসে পড়ে। এই ব্যবস্থায় এক একটী কারখানায় শত শত শ্রমিক কাজ করে। সাধারণত তাদের জীবন জুড়ে থাকে যন্ত্রের সঙ্গে, দীর্ঘ বাজারের সঙ্গে এবং ব্যবস্থা ও রুটীনের সঙ্গে। তাদিগকে বাজারের সঙ্গে তাল রেখে চল্‌তে হয়। কাজেই অনেক সময় তাদের ইচ্ছা ও শক্তির বিরুদ্ধে কাজ করার দরকার হয়। ব্যবস্থা ও রুটিনের সঙ্গে চলতে গিয়ে প্রায়ই ব্যবস্থাপকদের ব্যবস্থাশক্তি, সদ্ভাবনা এবং সততার উপরই তাদিগকে ভরসা ক'রতে হয়। ব্যবস্থা ভাল হ'লে বা সদ্ভাবসম্পন্ন ব্যবস্থাপক হ'লে শ্রমিকদের কাজের সুবিধা হয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয় না। কেন না ব্যবস্থাপকদের লক্ষ্য থাকে অমুক পরিমাণ কাজ করান। বিশেষীকরণ (specialisation) অনুসারে তাদের কাজের এমন ব্যবস্থা থাকে যে ইচ্ছায় অনিচ্ছায়, সক্ষমতায় অক্ষমতায় সর্বাবস্থায় শ্রমিকদিগকে যন্ত্রের সঙ্গে যন্ত্রের মত কাজ ক'রে যেতে হয়। কারখানার মালিক বা ব্যবস্থাপকদের সঙ্গে শ্রমিকদের সম্বন্ধ থাকে শুধু পয়সা এবং শ্রমের। এত লোকের সঙ্গে মানবীয় জীবনের কৌটুম্বিক বা অন্য কোন প্রকার মধুর সম্বন্ধ রাখা কার্যতঃ সম্ভব হ'য়ে উঠে না। কাজেই স্বাভাবিক ভাবে কারও প্রতি কারও দরদ থাকে না। শ্রমিকদের জীবন কারখানার মালিক এবং ব্যবস্থাপকদের হাতে বাঁধা থাকায় তারা সব সময়েই তাদিগকে শোষণ করতে চায়। ফলে শ্রমিকদের হয় অসুবিধা। চিরদিন নানাপ্রকার অসুবিধায় দিন কাটাতে কাটাতে তারা জীবনের মাধুর্য একেবারে হারিয়ে ফেলে। তাদের দুঃখ দেখে অনেক সৎ লোকের প্রাণে ব্যথা লাগে। তাঁরা শ্রমিকদিগকে সংঘবদ্ধ ক'রে মালিকদের কাছে উচিত দাবি জানান। সেই রকম করতে গেলে মালের উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষাকৃত বেশী

পড়ে। সেইজন্য মালিকেরা শ্রমিকদের দাবি শেষ পর্য্যন্ত পূরণ না করবারই চেষ্টা করে। এইভাবে শ্রমিক এবং মালিকের মধ্যে টানাটানি চল্‌তে থাকে।

আসলে শ্রমিক সমস্যার উদ্ভব হয় ধনবৈষম্য থেকে। ধনবৈষম্য এবং কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা থাকলেই শ্রমিক সমস্যা চরমে পৌঁছে। পুঁজিবাদ এবং সাম্যবাদ উভয় ব্যবস্থাতেই অধিকার এবং সম্পদ কেন্দ্রীভূত থাকে। এই দুইয়ের মধ্যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় অধিকারের চেয়ে সম্পদ বেশী কেন্দ্রীভূত থাকে এবং সাম্যবাদী ব্যবস্থায় সম্পদের চেয়ে অধিকার থাকে বেশী কেন্দ্রীকৃত। মানবের পক্ষে এটা আরও বিপজ্জনক।

রুশদেশে বিশেষ ধনবৈষম্য না থাকায় পুঁজিবাদী রাজ্যের মত সেখানে শ্রমিক সমস্যা নাই বটে, কিন্তু অধিকার কেন্দ্রীকৃত থাকায় সেখানে জনসাধারণের জীবন যন্ত্রবৎ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য লোপ পাচ্ছে। প্রত্যেক ব্যক্তির প্রকৃতিদত্ত গুণ, শক্তি ও রুচিগুলি নিজেদের ইচ্ছামত কাজে লাগাবার কোন অবকাশ পাচ্ছে না। পুঁজিবাদী রাজ্যে অধিকার বৈষম্য হেতু আজ যেমন শ্রমিক সমস্যা দাঁড়িয়েছে একদিন এমন আসবে যখন রুশ বা রুশের মত অন্য সাম্যবাদীরাজ্যে এই অধিকার বৈষম্য নিয়ে একটা ভীষণ আন্দোলন আরম্ভ হবে। কেন না মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বেশীদিন দাবিয়ে রাখা সম্ভব নয়।

কেন্দ্রীকরণ যতই দৃঢ় বা ঘনীভূত হয় বাজারে ছোট ছোট স্বাধীন ব্যবসায়ী ততই লোপ পায়। বড় বড় ব্যবসায়ী এবং পুঁজিবাদীরা মিলে তাকে কোনঠাসা ক'রে নিজেদের অধিকার কায়েম করে। তাদেরই হাতে উৎপাদনের সাধন থাকায় তারাই বেশী লোককে খাটাতে পারে। কাজেই শ্রমিক তাদেরই হাতে এসে যায়। এইভাবে শ্রমিকরা অনন্যোপায় হ'য়ে উঠলে তাদের শোষণ করে।

(১৪) কাঞ্চনমূলক অর্থব্যবস্থা (Money Economy) :—এই

পুঁজিবাদী কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা থেকেই কাঞ্চনমূলক অর্থব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এই ব্যবস্থায় আমাদের সমাজ-জীবনের সর্বক্ষেত্রে এখন কাঞ্চন বা মুদ্রাই আসর জমিয়েছে। এখন কোনও জিনিষের মূল্য আমরা তার অন্তর্নিহিত শক্তি বা গুণের কথা না ভেবে অথবা আমাদের জীবনে তার আবশ্যকতার গুরুত্ব বিচার না ক'রে মুদ্রার কষ্টিপাথরেই কষি। জিনিষের মূল্য নির্ভর করে জনসাধারণের উৎপাদন ক্ষমতা এবং সামাজিক আবশ্যকতার উপর। কিন্তু এই মুদ্রামূলক অর্থব্যবস্থায় জিনিষের মূল্য নির্ভর করে মুদ্রার উপর বা পয়সার বাজারের উপর এবং কৃত্রিম আবশ্যকতার উপর। যারা কৃত্রিম বা অনাবশ্যক আবশ্যকতার সৃষ্টি করে তারা (পুঁজিপতি শ্রেণী) ভাবে না যে জনসাধারণের প্রকৃত আবশ্যকতা কি। আর জনসাধারণও নিজেকে ভুলে তাদের চাকচিক্য ও আড়ম্বরপূর্ণ প্রচারের অগ্নি শিখায় পতঙ্গের মত ঝাঁপিয়ে প'ড়তে থাকে। তখন পয়সাই জিনিষের মূল্য নির্ধারণের প্রধান কষ্টিপাথর হয়ে প'ড়ে। উপভোগ্য বস্তুর আবশ্যকতা যত বেশী হয় পয়সার আবশ্যকতাও তত বেশী হ'য়ে পড়ে। পুঁজিপতিরা মৌলিক আবশ্যকীয় জিনিষের চেয়ে বিলাস-ব্যসন, ফ্যাসন এবং আধুনিক সভ্যতাসূচক জিনিষেরই বাজার সৃষ্টি করে। কারণ মৌলিক আবশ্যকীয় জিনিষের চেয়ে এই সমস্ত জিনিষের কারবারে লাভ বেশী হয়। লোক এই সমস্ত জিনিষে অভ্যস্ত হ'য়ে উঠলে মৌলিক আবশ্যকীয় জিনিষের উপর তত গুরুত্ব দিতে পারে না। এইগুলির আবশ্যকতা বেশী হওয়ায় পয়সাই সেইগুলি প্রাপ্তির একমাত্র উপায় হ'য়ে দাঁড়ায়। তখন পয়সার দ্বারাই সব জিনিষের মূল্য নির্ণয় হয়। পয়সা সহজে নষ্ট হয় না। কিন্তু দুধ, মাছ, ডিম এবং ফল ইত্যাদি সহজে নষ্ট হয়। কাজেই যার হাতে পয়সা থাকে সে যদৃচ্ছা কিনতে পারে। এই সমস্ত জিনিষের বিক্রেতা (কাঁচামাল উৎপাদক) অসুবিধায় পড়লে বা তাদিগকে অসুবিধায় ফেলে পয়সার মালিক (পুঁজিপতি) যদৃচ্ছা শোষণ করতে চায়।

এই ব্যবস্থায় সমতা বা ন্যায় বিচার লোপ পেতে বসেছে। জিনিষের ক্ষেত্রে যেমন শ্রমের ক্ষেত্রেও তেমনি। শ্রমিকের হাতে পয়সা থাকে না—থাকে শ্রম। কিন্তু এই পুঁজিবাদী যন্ত্রজাত-জিনিষ-ব্যবহার-মূলক-সভ্যতার ব্যবস্থায় তার আবশ্যকীয় প্রত্যেকটি জিনিষের জন্য পয়সার দরকার হয়। কাজেই পয়সার মালিকের (মিল মালিক বা মহাজনের) হাতে তারা বাঁধা পড়ে। সুযোগ পেলে বা সুযোগ ক'রে তারা যদৃচ্ছা শোষণ করে। এই শোষণ থেকে বাঁচবার জন্য শ্রমিক চায় পয়সা আয় করতে আর মালিকেরা চায় কম দিতে। এই প্রকার চিরন্তন দ্বন্দ্ব লেগে থাকে। পয়সা উভয়েরই কাম্যবস্তু হ'য়ে পড়ে। শ্রমিকের মত আমরা (উপভোক্তারা) আমাদের আবশ্যকীয় প্রায়ই কোনও পাকা জিনিষ নিজেরা উৎপাদন করি না। এক শ্রেণীর লোক (যন্ত্রপতি বা পুঁজিপতি শ্রেণী) আমাদের আবশ্যকীয় মাল উৎপাদন করে এবং আমাদের কাছে যোগান দেয়। আমরা সেইগুলি পয়সা দিয়ে কিনি। কাজেই পয়সা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নাই। সেজন্য পয়সা উপার্জন আমাদের জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হ'য়ে দাঁড়ায়। এই পয়সার লোভে হোক বা পয়সার আবশ্যকতার বোধেই হোক আমরা ছেলেদের অভুক্ত রেখে তাদের প্রাণস্বরূপ (আমাদেরও বটে) মূল্যবান বস্তু দুধ বাজারে বিক্রয় করি। ভাল ফলমূল তরিতরকারী বাজারে নিয়ে হাজির হই। যাদের পয়সা থাকে তারাই সে সব জিনিষ কিনে খায়। তার মানে কাঁচামাল উৎপাদকেরা পাকামালওয়ালা এবং পয়সাওয়ালাদের হাতে বাঁধা পড়ে। একটু তলিয়ে দেখলে আমরা দেখতে পাব এই কারণে কাঁচামাল উৎপাদনকারী দেশ পাকামাল উৎপাদনকারীদের কবলে পড়ে। কেন না হিসাব ক'রে দেখা গেছে কাঁচামালের চেয়ে পাকামাল উৎপাদনে লাভ ঢের বেশী। একজন চীনাবাদাম উৎপাদনকারী কৃষক যে পরিমাণ চীনাবাদাম

উৎপাদন ক'রে বছরে ৮০৲ টাকা আয় করে, সেই পরিমাণ চীনাবাদাম মাড়িয়ে একজন তেল ব্যবসায়ী বছরে ৫০০৲ টাকা আয় করতে পারে এবং সেই পরিমাণ তেল থেকে একজন আতর ব্যবসায়ীর ১৫০০৲ টাকা আয় হ'তে পারে। এজন্য পাকামাল ব্যবসায়ীদের হাতে পয়সা বেশী থাকে। তারা অপেক্ষাকৃত বেশী দামে কাঁচামাল কিনতে পারে। অনেকক্ষেত্রে পয়সার লোভে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাকামালের আবশ্যকতা বোধে লোকে নিজের দরকারী কাঁচামাল বিক্রয় করতে বাধ্য হয়। কাঁচামাল উৎপাদনকারী ভারত এইভাবে ইংলণ্ডের মত পাকামাল উৎপাদনকারীর হাতে বাঁধা পড়েছিল; এখনও বাঁধন সম্পূর্ণরূপে কাটে নাই।

অতএব স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে পয়সাওয়ালাদের ক্রয়শক্তি বেশী। তাই তাদের হাতেই বাজার। আর বাজার যার হাতে জনসাধারণের জীবনের চাবি তারই হাতে। আজ বড় বড় সাহিত্যিক, কবি, দার্শনিক, ইঞ্জিনিয়ার, বৈজ্ঞানিক, শিক্ষক সকলেই পয়সাওয়ালাদের মুঠার মধ্যে। বৈজ্ঞানিকদের বড় বড় আবিষ্কার পয়সাওয়ালারাই (পুঁজিপতিরাই) হাতিয়ে নিয়েছে এবং তা থেকে অগাধ ধনের মালিক হয়েছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক বেচারা যেখানকার ঠিক সেইখানেই আছে। পুঁজিপতিরা দেশের সাহিত্যিক বা বৈজ্ঞানিক আদিকে যদৃচ্ছা নিজেদের স্বার্থে লাগাচ্ছে। তারাই নানাপ্রকার যন্ত্রপাতি, ফ্যাসন এবং অনাবশ্যক আবশ্যকতার সৃষ্টি করছে। আজ বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায় পুঁজিপতিদের এজেন্ট সেজে জনসাধারণ এবং নিজেদিগকেও ফাঁদে ফেলেছে। সেইজন্য আজ জনজীবনের প্রকৃত মঙ্গলদায়ক সাহিত্য, দর্শন, অর্থশাস্ত্র, রাজনীতিশাস্ত্র ইত্যাদি খুঁজে পাওয়া যায় না। আজ যেমন বাজারে খাঁটী জিনিষ পাওয়া যায় না তেমনি খাঁটী সাহিত্যও পাওয়া যায় না। আজ সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে পয়সা এবং ব্যবসায় প্রবেশ করেছে।

পয়সা বেশী থাকলেই যদি দুধ, ঘি, ফল মূল, তরিতরকারি থেকে আরম্ভ করে বড় বড় বৈজ্ঞানিক এবং সাহিত্যিককেও কেনা যায়, তা' হলে এমন কে বোকা আছে যে বেশী পয়সা আয় করতে না চাইবে? কাজেই আজ সমাজে পয়সা উপার্জনের জন্য একটা বেশ হুড়োহুড়ি প'ড়ে গেছে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা আজ চরম সীমায় পৌছেছে। এই প্রতিযোগিতার ফলেই আজ আমাদের সমাজের সর্বত্র দুর্নীতি প্রবেশ করেছে। নৈতিক জীবন ক্রমে নীচের স্তরে নেমে যাচ্ছে। এই কাঞ্চনমূলক অর্থব্যবস্থার অবসান না করে কি সমাজের দুর্নীতি দমন করা সম্ভব?

পয়সা উপার্জনের এই প্রকার হুড়োহুড়িতে ক্রেতা এবং বিক্রেতা বা উৎপাদক এবং উপভোক্তাদের মধ্যে বেশ টানাটানি হয়। সব সময়েই একে অপরকে ঠকাতে চায়। সেই জন্য আজ জীবিকা অর্জনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে ঠকাবার বিদ্যাটা বেশ বেড়ে যাচ্ছে। জিনিষে ভেজাল দেওয়ার বিদ্যায় ব্যবসায়ীরা এমন পাকা হয়েছে যে কারও সাধ্য নাই সে ভেজাল বুঝতে পারে। ভেজাল দেওয়ার নিত্য নূতন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আবিষ্কার হচ্ছে। বুদ্ধিজীবিরা ঠকাবার বাক্‌চাতুর্যে দিন দিন পাকা হচ্ছে। শ্রমিকেরা শ্রম চুরিতে অভ্যস্ত হচ্ছে। এইভাবে শ্রম চুরি, সময় চুরি, মিথ্যা সাক্ষ্য, মিথ্যা যুক্তি, মিথ্যা বিজ্ঞাপন, জাল-জোচ্চুরি প্রভৃতি সমাজ জীবনের প্রতি নাড়ী ধমনীতে প্রবেশ করছে।

এই কাঞ্চনমুলক ব্যবস্থার দ্বারাই দীর্ঘ বাজারের (Long market) কারবার সম্ভব হয়েছে। পৃথিবীর এক কোণ থেকে অপর কোণ পর্যন্ত মালের অনায়াসে আদান-প্রদান চলেছে। এই দীর্ঘ বাজার এবং যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্য উৎপাদন এবং বেতনের সামঞ্জস্য বজায় রেখে সমবণ্টনের দ্বারা প্রজাদের মঙ্গল সাধন করা কোনও সরকারের পক্ষে সম্ভব হয় না। অনেক সময় ইচ্ছা থাকলেও সরকার পেরে উঠে না। নানা জায়গায়

নানা প্রকার ঝামেলা সামলাবার ব্যাপারে বিব্রত থাকতে হয়। এমন অবস্থায় কোনও শ্রমিক বা কর্মচারীর পক্ষে নিজের বুদ্ধি, ইচ্ছা বা রুচিমত কাজ করা কখনও সম্ভব হয় না।

১৫। প্রাচুর্যের মধ্যেও অভাব এবং দারিদ্র্য :—বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে অল্প সময়ে মানুষের আবশ্যকীয় জিনিষ প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এই পুঁজিবাদী প্রথা উৎপাদন এবং বিতরণকে এমন বিকৃত ক'রে তুলে যে এত প্রাচুর্যের মধ্যেও সমাজের অতি অল্প সংখ্যক লোক ছাড়া আরাম বা সুবিধা ত' দূরের কথা কোনও ক্রমে জীবনটুকু বাঁচিয়ে রাখার মত আবশ্যকীয় জিনিষও তাদের ভাগ্যে জুটে না। এখন বড় বড় ব্যবসায়ীদের হাতে জনসাধারণের জীবন বাঁধা। তারা নিজেদের সত্তা বজায় রাখ্‌বার জন্য ইচ্ছামত মালের দাম বেশী বা কম করে, উৎপাদনও সেই অনুপাতে কম বা বেশী করে। কখনও কখনও মালের দাম কম না করার জন্য হাজার হাজার মণ মাল সমুদ্রে ফেলে অথবা পুড়িয়ে বা অন্য ভাবে নষ্ট ক'রে দেয়।

১৬। শ্রমিকদের দুরবস্থা :—টাকার অঙ্কে উৎপাদন ব্যয় কম করা পুঁজিবাদী প্রথার প্রধান লক্ষ্য। এই জন্য অন্য নানা প্রকার উপায়ের মধ্যে শ্রমিক শোষণ একটি বড় জিনিষ। শ্রমিকদের পারিশ্রমিক কম দেওয়া, বেশী সময় কাজ লওয়া, আবাসের সুব্যবস্থা না করা ইত্যাদি ছাড়া নিত্য কম সংখ্যক শ্রমিকের দ্বারা কাজ লওয়ার উপায়ও উদ্ভাবন করতে থাকে। এক এক সময় এমন মেসিনের আবিষ্কার করে যাতে হাজার হাজার শ্রমিক বেকার হ'য়ে যায়। এক সময় হেনরী ফোর্ড 'টি' নমুনার মোটরের স্থলে 'এ' নমুনার মোটর দাখিল ক'রে ৬০০০০ শ্রমিককে বেকার করে দিয়েছিল। অল্পদিন আগে যেখানে ৫০ জন লোক এবং ১০০টি বলদ যে পরিমাণ জমি আবাদ করতে পারতো, আজ একটি ট্রাকটর সেই কাজের পক্ষে যথেষ্ট। এখন আবার বুদ্ধিজীবিদের

উপরও আপদ এসে পড়েছে। এখন এক প্রকার এমন মেসিন আবিষ্কার হয়েছে যার দ্বারা অতি সহজে আপনি গণিতশাস্ত্রের অনেক জটিল সমস্যারও সমাধান করতে পারেন। হয়ত কিছু দিন পরে শুনতে পাওয়া যাবে যখন একটি টেলিভিসনের মারফত দেশের সমস্ত কলেজে অধ্যাপনার কাজ করবার ফলে সব অধ্যাপকেরা বেকার হয়ে গেছেন। শুনা যাচ্ছে বিনা চালকে বিমান চালনার উপায় উদ্ভাবনেও আর বেশী দেরী নাই। আরও কত কি না হতে পারে!

১৭। স্বার্থপরতার বৃদ্ধি :—পুঁজিবাদের সমর্থকেরা বলে যে মানুষ স্বভাবতঃই স্বার্থপর। এই পদ্ধতির দ্বারা স্বার্থসিদ্ধির যথেষ্ট অবকাশ থাকে। কিন্তু এ কথা মনে রাখতে হবে যে মানুষ শুধু স্বার্থপর নয়। তার মধ্যে দয়া, প্রেম, সৌহার্দ্য এবং সেবা-ভাব আদি নানা প্রকার সদ্‌গুণও আছে। এইগুলির বিকাশেই মানুষের মঙ্গল। কিন্তু পুঁজিবাদী প্রথায় স্বার্থপরতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে আজ পরস্পর সৌহার্দ্য এবং প্রীতির ভাবনা নষ্ট হয়েছে। কেউ কারও মঙ্গল দেখতে পারে না।

১৮। প্রতিযোগিতা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার বৃদ্ধি :—পুঁজিবাদী প্রথায় প্রতিযোগিতার অবকাশ আছে। অনেকে বলে প্রতিযোগিতায় মানুষের বিকাশ হয়। প্রতিযোগিতা ব্যক্তিগতভাবে সমাজের কিছু লোকের পক্ষে বা ভৌতিক উন্নতির পক্ষে সহায়ক হ'তে পারে কিন্তু সমগ্র সমাজের দিক্ দিয়ে এবং মানবোচিত সদ্‌গুণ বিকাশের পক্ষে প্রতিযোগিতা মস্ত বড় অন্তরায়। দ্বিতীয়তঃ ভৌতিক উন্নতির দিক দিয়েও প্রতিযোগিতা ভবিষ্যৎ বংশধরদের পক্ষে অতীব অহিতকর। পুঁজিপতিরা প্রতিযোগিতার হুড়োহুড়িতে খনিজ পদার্থ এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক আবশ্যকীয় জিনিষের এমন অপব্যবহার ক'রে ফেলছে যার ফলে ভবিষ্যৎ বংশধর অনেক বিষয়ে অবলম্বনবিহীন হ'য়ে যাবে।

১৯। সংঘবদ্ধ শোষণ :—বৈজ্ঞানিক যুগে পুঁজিবাদী প্রথায়

উৎপাদনের ফলে নানা প্রকার জিনিষপত্রের আদান-প্রদানে দেশ-বিদেশের পরস্পর সম্বন্ধ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর পুঁজিবাদীবর্গের সংঘবদ্ধ হওয়ার সুযোগ হ'ল। যেহেতু ব্যক্তিগত লাভ ও শোষণের উপরই পুঁজিবাদীদের অস্তিত্ব, কাজেই পুঁজিবাদীদের সংঘবদ্ধ হওয়ার ফলে একদিকে পৃথিবীতে সংঘবদ্ধ শোষণ আরম্ভ হ'ল। পুঁজিপতিরা ক্রমে মানবতা থেকে অনেক দূরে স'রে যেতে লাগ্‌লো এবং অন্যদিকে জনসমাজকে পদে পদে অর্থ সঙ্কটের সম্মুখীন হ'তে হ'ল।

এই ভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে পুঁজিবাদই দেশের বর্তমান সর্বপ্রকার শোচনীয় পরিণামের মূল।

তৃতীয় অধ্যায়

পুঁজিবাদের ক্রমবিকাশ

অনেকে বলে এবারে পুঁজিবাদের যুগ গেল এখন সাম্যবাদের যুগ এলো কিন্তু একথা ভুল। একটু তলিয়ে দেখলে বুঝা যাবে সাম্যবাদ পুঁজিবাদেরই বিকশিত রূপ বা সংগঠিত পুঁজিবাদের ক্রমবিকাশ থেকেই সাম্যবাদ এটা বেশ বুঝা যায়।

মোটা কথায় পুঁজিবাদ মানে ব্যক্তিগত, শ্রেণীগত বা রাষ্ট্রগত লাভ অথবা স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ এবং উৎপাদনের সাধনের উপর মালিকানা—একথা আগেই বলেছি।

প্রাথমিক স্থিতি—সমাজের প্রথমাবস্থায় এইপ্রকার মালিকানা বা অধিকারের কোনও প্রশ্নই ছিল না। সকলেই ইচ্ছামত প্রাকৃতিক সম্পদ এবং উৎপাদনের সাধনের উপযোগ এবং উপভোগ করতো।

ব্যক্তিগত পুঁজিবাদ—(Individual Capitalism)—তারপর

জীবনধারণ প্রণালীর রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গেই সমাজের রূপ পরিবর্তন হ'ল। সমাজে সর্দার, মুখিয়া, জায়গীরদার জমিদার ও রাজা ইত্যাদির সৃষ্টি হ'ল। ক্রমে 'রাজা রাজস্য কারণম' 'রাজা দেবতার অংশ' ইত্যাদি মতবাদের সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা জন্মালো। তখন ব্যক্তি—সর্দার, মুখিয়া, জমিদার বা রাজা হিসাবে নানা প্রকার স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টায় লাগলো। এই ভাবেই ব্যক্তিগত পুঁজিবাদের আরম্ভ।

প্রথমাবস্থায় রাজারই প্রাধান্য ছিল বেশী। সেইজন্য মানুষের গ্রাসাচ্ছাদনের আবশ্যকীয় মাল উৎপাদন এবং বিতরণ ব্যাপারে তারই প্রাধান্য থাকা স্বাভাবিক ছিল। এইজন্য অনেক ক্ষেত্রে রাজার পক্ষে স্বৈরাচারী হওয়া যেমন স্বাভাবিক ছিল তেমনি তার অধীন মুখিয়া, সর্দার বা জমিদারদেরও। তখন তাদের মধ্যে তেমন কোনও সংগঠন ছিল না বা রাজার পক্ষে সব বিষয়ে নজর রাখাও সম্ভব হ'তো না। ফলে তারাও অনেক স্থলে যথেচ্ছাচার করতো এবং স্বার্থ সিদ্ধির জন্য জনসাধারণকে শোষণ করবার চেষ্টা করতো।

জনতান্ত্রিক পুঁজিবাদ বা শ্রেণীগত পুঁজিবাদ :—(Democratic capitalism বা class capitalism) :—উৎপাদন এবং বিতরণ ব্যাপারেও জটিলতার সৃষ্টি হ'ল। রাজ্যশাসন ব্যাপারও জটিল হ'ল। এই সমস্ত কারণে একদিকে ক্রমে যেমন শাসক শ্রেণীর গুরুত্ব বেড়ে চললো অন্যদিকে তেমনি ব্যবসায়ীদের হাতে বেশী পুঁজি জমা হ'তে লাগলো। উৎপাদনের যন্ত্রপাতি নিত্য নূতনরূপে আসতে লাগলো।

এইভাবে রাজ্যে রাজা, শাসকবর্গ, পুঁজিপতিবর্গ (ব্যবসায়ী মহাজন ইত্যাদি এবং জনসাধারণ এই চারটি বর্গ দাঁড়ালো। এই রকম অবস্থায় শাসকবর্গ এবং পুঁজিপতিবর্গের সহায়তা ছাড়া রাজার পক্ষে রাজ্য শাসন সম্ভব হ'ল না। তাদের উপর নির্ভর করতে হ'ল।

এদিকে জনসাধারণকেও অনেক বিষয়ে তাদেরই ইঙ্গিতে চলতে হ'ল। কাজেই তাদের মনে রাজার কর্তৃত্ব শক্তি কম করবার বাসনা জাগলো। তারা সময়ে সময়ে রাজার নিরঙ্কুশতার সুযোগ নিয়ে বা নিরঙ্কুশতার ওজুহাত দেখিয়ে কর্তৃত্ব শক্তি হাতে লওয়ার চেষ্টা ক'রলো। সময়ে সময়ে রাজার বিরুদ্ধে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ ক'রলো। অনেক ক্ষেত্রে রাজাকে রাজগদিতে রেখে জনতন্ত্রের নামে রাজ্যশাসনের চাবি হাতে নিল।

এই কাজে পুঁজিপতিবর্গ এবং শাসকবর্গ সংঘবদ্ধ হ'ল। কাজেই প্রকৃতপক্ষে এই উভয় শ্রেণীই জনসাধারণের আর্থিক ও রাজনীতিক জীবনে অধিকার জমালো—একবর্গ শাসকরূপে এবং অন্যবর্গ মহাজন, শেঠ বা বড় বড় ব্যবসায়ীরূপে।

এই পর্যায়ে এসে রাজনীতিক্ষেত্রে শাসন এবং অর্থনীতিক ক্ষেত্রে শোষণ আরও সংঘবদ্ধ হ'ল। পুঁজিবাদ পূর্বাপেক্ষা বেশী সংগঠিত হ'ল। ফলে জনসাধারণের স্বতন্ত্রতা আরও সঙ্কুচিত হ'ল এবং শোষণের মাত্রাও বেড়ে চললো।

আর্থিক সংগঠন—শাসকবর্গের আওতায় থাকুক অথবা মুষ্টিমেয় ধনপতিদের হাতে থাকুক—যতই কেন্দ্রীত হয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বা জনতন্ত্র ততই সঙ্কুচিত হয়। এই পর্যায়ে তাই হ'ল।

রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ (National capitalism)—অষ্টাদশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলির পর কিভাবে পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হ'ল সে বিষয়ের অনেকটা আভাষ দিয়েছি।

যেমন ব্যক্তিগত পুঁজিবাদের প্রতিক্রিয়া থেকে জনতান্ত্রিক পুঁজিবাদ বা শ্রেণীগত পুঁজিবাদের জন্ম তেমনি এই জনতান্ত্রিক পুঁজিবাদের প্রতিক্রিয়া থেকে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের সৃষ্টি। প্রাকৃতিক সম্পদ এবং উৎপাদনের সাধন ব্যক্তি বা শ্রেণীর হাত থেকে সমগ্র রাষ্ট্রের হাতে

আসুক এই নিয়ে আন্দোলন চললো। এই প্রতিক্রিয়া দুইভাবে প্রকাশ পেলো—সমাজবাদ (সাম্যবাদ) রূপে এবং ফাসিষ্টবাদ (নাজীবাদ) রূপে। এইভাবে সমাজবাদ এবং ফাসিষ্টবাদ একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ।

(১) ফাসিষ্টবাদ—ইটালীতে মুসোলিনীর নেতৃত্বে এর জন্ম। ইনি রাষ্ট্রকে সর্বময় কর্তা ক'রে তুললেন। রাষ্ট্রের দ্বারা পুঁজিপতিদের নিয়ন্ত্রণের অছিলায় পুঁজিপতি বর্গই রাষ্ট্রের কর্ণধার হ'ল।

শ্রমিকেরা রাষ্ট্রের অঙ্কুশ থেকে রক্ষা পেলো না। শ্রমিক আন্দোলন দাবান হ'ল। কারখানা প্রভৃতির হরতাল দণ্ডনীয় ঘোষিত হ'ল। কারখানার কাজ বন্ধ করবার তাদের অধিকার রইল না। ছোটখাট ব্যক্তিগত কাজ কারবারের উপর রাষ্ট্রের কড়া পাহারা প'ড়লো।

এই পর্যায়ে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য আরও লোপ পেলো। জীবিকার্জনের স্বাধীনতা খুবই সঙ্কুচিত হ'ল। ক্রমে রাষ্ট্র ছাড়া ব্যক্তির আর কোনও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রইল না। ব্যক্তি নিজেকে রাষ্ট্রের জন্য অর্পণ করতে বাধ্য হ'ল। 'রাষ্ট্রের জন্য জীবনদান' এই নিয়ম প্রবর্তিত হ'ল। রাষ্ট্রের জন্য যুদ্ধে যেতে সকলে বাধ্য রইল। স্ত্রীলোকেরা বেশী সন্তান উৎপাদনে নিযুক্ত হ'ল।

রাষ্ট্রের শাসন পদ্ধতি আর জনতন্ত্রমূলক রইল না। বর্তমান রুশের সর্বাধিকারী সাম্যবাদী দলের মত ফাসিষ্টদল ছাড়া অন্য সবদলের অস্তিত্ব লোপ পেলো। অন্য কোনও দলের উঁ-চুঁ করবার অধিকার রইল না। নিজ রাজ্যের স্বার্থসিদ্ধির জন্য অন্য রাজ্যজয় এবং যুদ্ধ অনিবার্যরূপে গৃহীত হ'ল।

এই মতবাদ ক্রমে পৃথিবীর নানাস্থানে ছড়িয়ে প'ড়লো। এই মতবাদ জাপানকে যুদ্ধপ্রেমী ক'রে চীনের বিরুদ্ধে দাঁড় করালো।

নাজীবাদ—ফাসিষ্টবাদ এবং নাজীবাদে মূলতঃ কোনও পার্থক্য

নাই। নাজীবাদকে ফাসিষ্টবাদের জার্মান সংস্করণ বলা যেতে পারে। ফাসিষ্টবাদের মত এতেও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য খুবই সঙ্কুচিত। ব্যক্তির অস্তিত্ব রাষ্ট্রের জন্য—রাষ্ট্রের উন্নতিই ব্যক্তির উন্নতি। রাষ্ট্র একটী সাধ্য এবং ব্যক্তি সেই সাধ্যে পৌছিবার একটী সাধন। উভয় বাদের মধ্যে তফাৎ এইটুকু বলা যেতে পারে যে মুসোলিনী রাষ্ট্রীয়তা বা জাতীয়তার নামে ইটালীকে সংঘবদ্ধ করেছিল এবং হিটলার জার্মান জাতিকে পৃথিবীর মধ্যে 'খাঁটি আর্য্য' ব'লে তার শুদ্ধতা বজায় রাখবার জন্য একপ্রকার সাম্প্রাদায়িকতার নামে সমগ্র জাতিকে সংঘবদ্ধ করেছিলেন এবং তার বিরোধীর প্রতি যে কোনও পন্থা অবলম্বন তাঁর পক্ষে অন্যায় ব'লে গণ্য হ'ত না। এই মতবাদ ইহুদীদের সর্বনাশে উদ্যত হ'য়েছিল। এ সম্বন্ধে মোটামুটি এই কথা বলা যেতে পারে যে এই মতবাদে রাষ্ট্রই সর্বময় কর্তা হিসাবে গণ্য হয়েছিল। রাষ্ট্রীয়তা বা জাতীয়তার নামে গরীব এবং মধ্যম শ্রেণীকে দাবিয়ে বা নিয়ন্ত্রিত ক'রে পুঁজিবাদের আসলরূপ কায়েম রাখাই এই উভয়বাদের মূল লক্ষ্য।

(২) সমাজবাদ—ইহাও একপ্রকার পুঁজিবাদ। পুজিবাদের সঙ্গে সাদৃশ্য নিম্নপ্রকার :—(ক) উভয়েই পুঁজী এবং জমির কেন্দ্রীকৃত নিয়ন্ত্রণ চায়। (খ) ভূরি উৎপাদন (Large scale productian) এবং বৃহদায়তন কৃষির (Large scale cultivation) উভয় মতবাদই সমর্থক। (গ) ভৌতিক উন্নতি সাধনই উভয়ের লক্ষ্য। (ঘ) ব্যক্তিগত পুজিবাদ বা অসংঘবদ্ধ পুঁজিবাদ এবং শ্রেণী পুঁজিবাদ বা আংশিক সংঘবদ্ধ পুঁজিবাদের সঙ্গে সমাজবাদের পার্থক্য শুধু উৎপাদনের অধিকার নিয়ে। একে উৎপাদনের অধিকার ছড়িয়ে থাকে ব্যক্তি-ব্যক্তিতে বা এক একটি শ্রেনীতে এবং অন্যে এই অধিকার ছড়িয়ে থাকে এক একটি বৃহৎ কেন্দ্রে বা রাষ্ট্রের হাতে।

সমাজবাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়—

(১) সমাজবাদের মূল সিদ্ধান্ত ভৌতিকবাদের উপর অধিষ্ঠিত। ধার্মিক, আধ্যাত্মিক, রাজনীতিক, সামাজিক—সর্বপ্রকার আন্দোলন, সর্বপ্রকার দলাদলি, সাম্প্রদায়িক বিভেদ এবং যুদ্ধ ইত্যাদির জন্ম ধনসম্পদ থেকে। মানুষের সভ্যতা, আচার, ব্যবহার, কৃষ্টি, কলা; বিচারধারা ইত্যাদি সমস্তই আর্থিক পরিবেশের দ্বারা নির্ণীত এবং নিয়ন্ত্রিত হয়। এই 'বাদ' হিসাবে মানুষের বিকাশ মানে সমাজের আর্থিক পরিবেশের বিকাশ। মানবের বিকাশ বা সমাজের বিকাশের সঙ্গে ধর্মের কোনও সম্বন্ধ নাই বরং তাহা অন্তরায় স্বরূপ।

(২) আদিম সমাজের প্রাথমিক অবস্থার পর আর্থিক ব্যবস্থায় প্রধানতঃ দুটি বর্গ বা শ্রেনীর উদ্ভব হয়—মালিক এবং মজুর। বিভিন্ন সময়ে এই দুটি শ্রেণী বিভিন্ন নামে কথিত হয়। কখনও মালিক এবং গোলাম নামে, কখনও জমিদার বা জায়গীরদার এবং কৃষকরূপে আর কখনও বা পুঁজিপতি এবং শ্রমিকরূপে।

সমাজবাদ মতে এই দুটি শ্রেণীরহিত পরস্পর বিরুদ্ধ। একের হিতে অপরের অহিত এবং একের লাভে অপরের হানি বা একের আড়ম্বরপূর্ণ জীবনের আধার অপরের শোষণ। আর্থিক ক্ষেত্রে মালিক বা পুঁজিপতিদের প্রাধান্য বেশী।

আর্থিক জীবনের সঙ্গে রাজনীতিক জীবন ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। দ্বিতীয়তঃ আর্থিক পরিবেশই রাজনীতিক পরিবেশের রূপ দেয়। আর্থিক ক্ষেত্রে পুঁজিপতিদের প্রাধান্য থাকায় রাজনীতিক ক্ষেত্রে তাদেরই প্রাধান্য বেশী হয়। রাজ্যের মন্ত্রীমণ্ডলে তারাই অধিকার জমায়। সরকার তাদেরই দ্বারা চালিত হয়। এইপ্রকার পরিবেশে পুঁজিপতি এবং মজুরের চিরন্তন সংঘর্ষ চলতে থাকে। এই সংঘর্ষের পরিসমাপ্তি তখনই সম্ভব যখন ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ হ'য়ে

সর্বপ্রকার সম্পত্তি রাষ্ট্রের ব'লে গণ্য হবে। সরকারই সব রেল, জাহাজ, কলকারখানা, জমি এবং ব্যাঙ্ক আদির মালিক হবে এবং সরকারের দ্বারাই সব কিছু ব্যবস্থিত এবং নিয়ন্ত্রিত হবে। তখন ব্যক্তিগত স্বামিত্ব লোপ পাবে। এই ভাবে সামূহিক স্বামিত্ব স্থাপন ক'রতে পারলে বিষমতা দূর হবে এবং বিষমতার সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণী সংঘর্ষ ও শ্রেণী সংঘর্ষজাত কোনও প্রকার অশান্তি থাকবে না।

বলা বাহুল্য রাষ্ট্রের সমস্ত সম্পদে ব্যক্তিগত মালিকানা না হ'য়ে রাষ্ট্রগত মালিকানা হ'লে অধিকার কেন্দ্রীকৃত হয়।

(৩) পুঁজিবাদী কেন্দ্রীয় ব্যবস্থায় আবশ্যকীয় জিনিষ উৎপাদনে শ্রমিকবর্গ শোষিত হয়, পুঁজিপতিরা অত্যধিক লাভ করবার জন্য শ্রমিকদের শ্রম যথেচ্ছভাবে কাজে লাগাবার চেষ্টা করে। পারিশ্রমিক যতদূর সম্ভব কম দিয়ে জিনিষের দাম সস্তা ক'রতে চায়। এই প্রকার অন্যায় বন্ধ ক'রতে হ'লে জিনিষের মূল্য ন্যায্য শ্রমের হিসাবেই নির্ধারিত হওয়া উচিত।

শ্রমিকের ন্যায্য পারিশ্রমিক নির্ণয়ে দুই মত দেখা যায়। এক মত বলে কাজের পরিমাণ ও গুণ হিসাবে নির্ণয় হওয়া উচিত। যে যত পরিমাণ কাজ ক'রবে বা যে ধরণের কাজ ক'রবে তাকে পারিশ্রমিক সেইভাবে দেওয়া হবে (সে পারিশ্রমিক তার পোষণযোগ্য হোক, অতিরিক্ত হোক বা কম হোক সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখার দরকার নাই)।

অন্য মত বলে উৎপন্ন সম্পত্তি থেকে শ্রমিক তার পোষণযোগ্য অংশ পাবে। শ্রমিক শক্তিমত কাজ ক'রবে এবং তার আবশ্যকমত গ্রহণ ক'রবে।

পারিশ্রমিক যে ভাবে দেওয়া হোক না কেন এর জন্য একটা কেন্দ্রীয় ব্যবস্থার দরকার হবে এবং সরকারকেই সেই কেন্দ্রীয় ব্যবস্থার ব্যবস্থাপক হ'তে হবে।

সমাজবাদ এবং সাম্যবাদ—এই উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে দুই মত দেখা যায়। সমাজের ক্রমবিকাশে বিশ্বাসবান ব্যক্তিরা বলেন শ্রেণী বৈষম্য এবং শোষণ বন্ধ ক'রতে হ'লে বৈধানিক উপায়ে এবং পার্লামেণ্টারী আন্দোলনের (রাজগদি দখল করার আন্দোলন) দ্বারা রাজক্ষমতা হাতে লওয়া উচিত আর বৈপ্লবিক পন্থায় বিশ্বাসী লোকেরা বলেন, বৈধানিক উপায়ে সমাজবাদ স্থাপন হ'তে পারে না। কারণ রাজ্য ব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুঁজিপতিরা দখল এবং প্রভাব জমিয়ে বসেছে। এইজন্য মজুর সংগঠন ক'রে হরতাল করা বা অন্য যে কোনও উপায়ে পুঁজিপতিদের প্রাধান্য নষ্ট করা দরকার।

এই ভাবে মোটামুটি সমাজের ক্রমবিকাশে বিশ্বাসশীল মতাবলম্বীদের সমাজবাদী এবং বৈপ্লবিক পন্থায় বিশ্বাসীদের সাম্যবাদী (কমিউনিষ্ট) বলা হয়। কিন্তু উভয়েই শ্রেণী বৈষম্য এবং শোষণ নিবারণের জন্য রাজসত্তা এবং কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা রাজ্যের হাতে রাখা অনিবার্য মনে করেন। উভয়ের মধ্যে সমতা ও পার্থক্য নিম্নপ্রকার :—

সমাজবাদ এবং সাম্যবাদে সমতা—

(১) পুঁজিবাদের প্রতিক্রিয়া থেকেই উভয় মতবাদের জন্ম।

(২) উৎপাদনের সাধনের উপর উভয়েই কোনও ব্যক্তি বা কোনও শ্রেণীর অধিকার রাখার বিরোধী। উভয়েই সার্বজনিক অধিকারের পক্ষপাতী।

(৩) শ্রেণীহীন এবং শোষণহীন সমাজগঠনই উভয়ের লক্ষ্য। উভয়েই জনমঙ্গলের জন্য সর্বাধিক সুযোগ দেওয়ার পক্ষপাতী।

(৪) উভয় ধারায় প্রত্যেক ব্যক্তি শ্রম করতে বাধ্য।

(৫) উভয় ধারায় প্রত্যেক ব্যক্তির ভরণপোষণ বা জীবিকা নির্বাহের জন্য আবশ্যক খাদ্য, বস্ত্র, গৃহ, চিকিৎসা এবং শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে।

অনেকে রুশদেশের বর্তমান শাসন পদ্ধতিকে সাম্যবাদী শাসন

বলে কিন্তু রুশ সরকার নিজেকে এখনো সাম্যবাদী বলে না। সেখানে এখন সন্ধিকাল।

বর্তমান রুশীয় সাম্যবাদ এবং পুঁজিবাদের তত্ত্বতঃ কোনও ভেদ নাই। উৎপাদনের সাধনের উপর অধিকার এবং নিয়ন্ত্রণ, ভাড়া, ভাতা বেতন ইত্যাদি ব্যাপারে উভয় রাজ্যেই এক বর্গের সঙ্গে অন্য বর্গের পার্থক্য বিদ্যমান। উভয় রাজ্যেই জনসাধারণের উপর এক একটা বিশালকায় সরকারের বোঝা—যার পরিচালকবর্গ কোনও মৌলিক উৎপাদক শ্রম না ক'রেও জনসাধারণের কষ্টার্জিত সম্পদের উত্তম অংশ গ্রহণ করে এবং তাদের নিয়ন্ত্রণ করে। উভয় রাজ্যেই অল্প লোকের হাতে বিরাট জনসমূহের জীবন বাঁধা। হিংসাকে অবলম্বন ক'রেই উভয় রাষ্ট্র টিকে থাকে।

পার্থক্য—

১। সমাজবাদ সমাজের ক্রমবিকাশে বিশ্বাসশীল। সেইজন্যই সমাজবাদীরা যতদূর সম্ভব শান্তিপূর্ণ এবং বৈধ উপায়ে রাজক্ষমতা হাতে লওয়ার পক্ষপাতী।

কিন্তু সাম্যবাদী মনে করে বলপূর্বক বিপ্লবের দ্বারাই সাম্যবাদ স্থাপন সম্ভব। সাম্যবাদীর পক্ষে হিংসা অহিংসা শান্তি অশান্তির কোনও বালাই নাই।

২। সমাজবাদী প্রথায় সরকারের চিরন্তন অস্তিত্ব অনিবার্য। কারণ সরকারের মারফতই সমাজবাদী ব্যবস্থা স্থাপন এবং কায়েম রাখা সম্ভব।

কিন্তু সাম্যবাদী ব্যবস্থা স্থাপনের অন্তিম অবস্থায় সরকারের কোনও অস্তিত্ব থাকবে না। এই ব্যবস্থা যতই কায়েম হবে সরকারের অস্তিত্ব ততই কমবে এবং এমন সময় আসবে যখন গাছের শুকনো পাতার মত সরকার আপন হ'তেই শুকিয়ে ঝ'রে প'ড়বে—সরকারের কোন অস্তিত্বই থাকবে না।

৩। সমাজবাদী বিতরণ ব্যবস্থায় উৎপন্ন বস্তুর বিতরণে জোর দেওয়া হয় লোকের যোগ্যতা এবং শ্রমের পরিমাণের উপর।

সাম্যবাদী ব্যবস্থায় জোর দেওয়া হয় লোকের আবশ্যকতা এবং রুচির উপর। কিন্তু এ বিষয়ে কোনও বাঁধাধরা নিয়ম আছে ব'লে মনে হয় না। কারণ প্রথমে ঠিক করা হ'য়েছিল প্রত্যেকে শক্তিমত কাজ ক'রবে এবং যে যার আবশ্যক মত গ্রহণ ক'রবে। পরে হ'ল কাজের পরিমাণ হিসাবে গ্রহণ ক'রবে। অবশ্য এটা ঠিক যে, সাম্যবাদীরা চেষ্টা করেন যাতে রাষ্ট্রের প্রত্যেকে সুস্থ জীবন যাপনের যোগ্য উপার্জনক্ষম হয়। এখনো রুশদেশে আয়ের সমানতার আদর্শ স্থাপন সম্ভব হয় নাই।

৪। সমাজবাদ ধার্মিক ব্যাপারে নীরব থাকে কিন্তু সাম্যবাদ মনে করে ধর্ম একটা কুসংস্কার এবং বিত্তশালীদের বিলাস তৃপ্তির একটা চাল।

৫। সমাজবাদ অনেকটা জাতীয়তাপ্রবণ। ক্ষেত্রবিশেষে জাতীয়তাবাদের সমর্থন করে। কিন্তু সাম্যবাদ সম্পূর্ণভাবে আন্তর্জাতিকতায় আস্থাশীল। সাম্যবাদীরা বলে পৃথিবীর সমস্ত দেশে সাম্যবাদ স্থাপন না হ'লে সাম্যবাদের প্রকৃতরূপ দেখা যাবে না বা সাম্যবাদ বিপন্মুক্ত হবে না। কারণ পৃথিবীতে পুঁজিবাদী রাজ্য থাকলেই সে তার সস্তা মাল দিয়ে বা অন্য নানা উপায়ে রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা ক'রবেই। তাছাড়া তার অস্ত্রবল ত আছেই। এইজন্য সাম্যবাদী চায় বিশ্বব্যাপী বিপ্লব এবং অনুরূপ সংগঠন। এইজন্য একসময় ধ্বনি উঠেছিল "ওহে পৃথিবীর শ্রমিকশ্রেণী! সংঘবদ্ধ হও" (Workers of the world unite). এক সময় লেনিন বলেছিলেন, রুশের বিজয়ী কৃষক এবং শ্রমিকদের নেতৃত্বে বিশ্বের পদদলিত জনসাধারণ একদিন বিশ্ববিপ্লব ক'রবে। এইজন্য তিনি তৃতীয় আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট সংঘের (Third International) স্থাপনা করেছিলেন। কিন্তু ষ্ট্যালিন

পরে বর্তমান বিশ্বের পুঁজিবাদী এবং সাম্রাজ্যবাদী রাজ্যের তুলনায় নিজেদের শক্তিসামর্থ্যের কথা চিন্তা ক'রে আন্তর্জাতিকতার এই নীতি বিসর্জন দেন। এই জন্য ট্রটস্কী আদির মত আন্তর্জাতিকতাবাদীদের নির্বাসিত হ'তে হয় এবং অনেক দুঃসহ জ্বালা ভোগ ক'রে প্রাণ হারাতে হয়। শেষকালে ১৯৪৩ সালে তৃতীয় আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট সংঘ ভেঙ্গে দেওয়া হয়। এইভাবে রুশ-সাম্যবাদ থেকে আন্তর্জাতিকতার দৃষ্টিবিন্দু লোপ পায়। বরং ষ্ট্যালিন ব'লতেন, সাম্যবাদ এবং পুঁজিবাদ উভয়েই পাশাপাশি শান্তিতে থাকতে পারে।

সাম্যবাদের আলোচনায় প্রবেশ করার পূর্বে সমাজবাদের বিভিন্নরূপ সম্বন্ধে একটু জানা দরকার।

সাম্যবাদ চায় সরকারের হাতে বা কোনও কেন্দ্রীয় ব্যবস্থার হাতে ক্ষমতা থাকুক কিন্তু তার দুরুপযোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এবং রাজক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত রাখার জন্য সমাজবাদীদের মধ্যে দেশ কাল পাত্র ভেদে নিম্ন কয়েকটি মতের সৃষ্টি হ'ল।

১। রাষ্ট্রীয় সমাজবাদ (State Socialism)

২। সিণ্ডিক্যালিজম (Syndicalism) (শ্রমিক সংঘবাদ)

৩। গোষ্ঠীসমাজবাদ (Guild Socialism)

৪। নৈরাজ্যবাদ (Anarchism)

৫। সাম্যবাদ (Communism)

এখন সিণ্ডিক্যালিজম এবং গোষ্ঠীসমাজবাদের আর পৃথক কোনও অস্তিত্ব নাই বললেও চলে। এগুলি সমাজবাদ এবং সাম্যবাদে বিলীন হয়েছে কিন্তু তখন যে নৈরাজ্যবাদের জন্ম হয়েছিল তা এখনো লোপ পায়নি। এ পর্যন্ত কোনও দেশে নৈরাজ্যবাদ স্থাপিত হ'তে পারেনি বটে কিন্তু যুগে যুগে পৃথিবীর চিন্তাশীল মনীষিগণ এই আদর্শ স্থাপনের চেষ্টা ক'রে আসছেন। এ যুগে মহাত্মা গান্ধীর শাসন-শোষণহীন

সর্বোদয় সমাজও সেই নৈরাজ্যবাদের বিকশিত রূপ। নৈরাজ্যবাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নপ্রকার :—

নৈরাজ্যবাদ—অষ্টাদশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের পর পুঁজিবাদ ক্রমশঃ ঘনিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের হাত থেকে ক্রমে সরকারের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীকৃত হ'ল। ক্ষমতার অধিকারী হ'য়ে অনেকক্ষেত্রে সরকার ক্রমে নিরঙ্কুশ হ'তে লাগলো। একদিকে সরকারের অত্যাচার এবং শোষণ অন্যদিকে জনসাধারণের অসন্তোষ ও বিদ্রোহ বেড়ে চললো। সরকারের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের নানা উপায় হ'ল কিন্তু তার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ ক'রবার উপরোক্ত কোনও পন্থা কার্যকরী হ'ল না। তখন তার প্রতিক্রিয়ায় লোকের মনে রাজসত্তার সম্পূর্ণ-বিলোপ সাধনের কথা মনে জাগলো। কিন্তু মানুষের মন এখনো যথেষ্ট অবিকশিত। এখনো লোভ, হিংসা, মোহ অহংকারাদি দুর্গুণ যথেষ্ট পরিমাণে তার মধ্যে বিদ্যমান। পারস্পরিক সৌহার্দ্য এবং প্রীতির যথেষ্ট অভাব। সেইজন্য রাজ্যের অস্তিত্ব একটা আবশ্যক পাপ (necessary evil) হিসাবে গণ্য ক'রে সেই অস্তিত্ব যতটা সম্ভব কম করবার জন্য লোকে চেষ্টা করতে লাগলো। মনীষিরা ব'ললো যে, সরকারের শাসন সর্বাপেক্ষা কম সেইটাই শ্রেষ্ঠ (That govt. is the best which governs the least). কিন্তু আদর্শস্থিতিতে সরকারের কোনও অস্তিত্ব থাকবে না।

প্রথমে (১৭৭৬-১৮৩৪) গডউইন ব'ললেন মানুষ স্বভাবতঃই ভাল। বাইরের কোনও চাপ বা বাধা না থাকলে মানুষ পূর্ণতার দিকে অনেক দূর অগ্রসর হ'তে পারে। মানুষের বিকাশে রাজ্যের হস্তক্ষেপ করা অন্যায়। শিক্ষার ভার সরকারের হাতে থাকা উচিত নয়। দণ্ডপ্রথার পরিবর্তে হিতাহিত বোধ জানানই উত্তম পন্থা। সম্পত্তির বিতরণ ব্যবস্থা এমন হ'বে যাতে প্রত্যেক ব্যক্তির আবশ্যকতা পূরণ সহজে সম্ভব হয়।

তারপর প্রাউঢন (১৮০৯—১৮৬৫) ব'ললেন ব্যক্তিগত সম্পত্তি ন্যায়ের অন্তরায় স্বরূপ। তার দ্বারা সামাজিক বৈষম্যের সৃষ্টি হয় এবং সরকারের সত্তা অনিবার্য হ'য়ে উঠে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং সরকার দুটিই অবৈধ। একের উপর অন্যের শাসন ঘোর অন্যায়।

পরে বাকুনিনও (১৮১৪—১৮৭৬) রাজসত্তার সম্পূর্ণ লোপের বাণী প্রচার ক'রলেন। তাঁর মতে সমাজে কোনও প্রকার শাসন থাকা অন্যায়।

নৈরাজ্যবাদীরা ব'ললেন বলপ্রয়োগই সরকারের অবলম্বন। এইজন্য সমাজ থেকে শাসনের একেবারে লোপ হওয়া উচিত। শাসন ছাড়াও সমাজের ব্যবস্থা হ'তে পারে। বলপ্রয়োগে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য লোপ পায়। মানুষের বিকাশ রুদ্ধ হয়। এইজন্য সমাজে কোনও প্রকার বল প্রয়োগের অবকাশ থাকা অবাঞ্ছনীয়।

নৈরাজ্যবাদ ও সমাজবাদে সাদৃশ্য ও পার্থক্য—উৎপাদনের সাধনের উপর সর্বসাধারণের সমান অধিকারে উভয়েই বিশ্বাসী। কিন্তু নৈরাজ্য-বাদীরা কাজের জন্য শ্রমিকদের উপর বলপ্রয়োগে বিরোধী। তাঁরা বলেন কাজ করাই মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। কোনও কারণে কেউ কাজ কম ক'রলে বা না ক'রলেও উৎপন্ন দ্রব্যে তার সমান অংশ থাকা উচিত। সে ক্ষেত্রে সমাজবাদীরা বলে কাজ না ক'রে উৎপন্ন পদার্থের অংশ গ্রহণে কারও অধিকার নাই।

নৈরাজ্যবাদীরা ব্যক্তিগত পুঁজির বিরোধী। অন্যদিকে সমাজবাদীরা সম্পত্তির রাষ্ট্রীয়করণের পক্ষপাতী। তাঁরা বলেন রাজ্যের হাতে সমস্ত পুঁজি এলে সকলের লাভ হ'বে। কোথাও শোষণের অবকাশ থাকবে না। কিন্তু নৈরাজ্যবাদীরা বলেন রাজ্যের হাতে পুঁজিরাজ্য এলে পুঁজিপতির চেয়ে আরও বড় শোষক হ'য়ে দাঁড়াবে।

সমাজবাদের দোষগুণ বিচার—

১। সমাজবাদীদের মতে সম্পত্তির রাষ্ট্রীয়করণ হ'লে কেন্দ্রীকরণের দোষ থাকে না।

কিন্তু একথা ভুল। উভয় ব্যবস্থাতেই জনসাধারণের জীবন মুষ্টিমেয় লোকের হাতের মুঠার মধ্যে থাকে। কেন্দ্রীকরণে প্রথমে লোকের আর্থিক জীবন বড় বড় কেন্দ্রের মালিকের কবলে থাকে পরে এর ফলে যখন সেই বড় বড় কেন্দ্রের মালিকেরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে রাজ্যের সত্বারূঢ় হয় তখন জনসাধারণের আর্থিক, সামাজিক এবং রাজনীতিক জীবন সবকিছুই তাদের আয়ত্তে এসে যায়। তখন একনায়কত্বের (Dictetorship) সৃষ্টি হয়। আর্থিক ব্যবস্থার কেন্দ্রীকরণ হ'লে স্বাভাবিক নিয়মে সেইখানে আটকে থাকতে পারে না। তা থেকে রাষ্ট্রীয়করণ আসতে বাধ্য। আর্থিক ব্যবস্থার এই নিয়মে জনসাধারণ (কেন্দ্রীকরণের) প্রথমাবস্থায় ছোট বড় পুঁজিপতি বা ব্যবসায়ীদের হাতে বাঁধা থাকে পরে সেহ সমস্ত পুঁজিপতিরা প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে সত্বারূঢ় হ'লে তারা আমলাতান্ত্রিক শাসনের (Beaurocratic govt.) খপ্পরে পড়ে এবং পরিশেষে যখন রাষ্ট্রের হাতে সমস্ত ক্ষমতা আসে তখন একনায়কত্বের সৃষ্টি হয়। এই এক নায়কত্ব কোথাও ফাসিষ্টবাদ বা নাজীবাদরূপে এবং কোথাও সমাজবাদ বা সমষ্টিবাদরূপে দেখা দেয়। উভয় অবস্থাতেই জনসাধারণের জীবন বিপন্মুক্ত নয়।

২। লোকে বলে রাজ্যের হাতে বড় বড় যন্ত্রশিল্প থাকলে বড় শিল্পসুলভ প্রভূত লাভ ও সুবিধা ব্যক্তির না হয়ে রাষ্ট্রের হয়। তখন রাষ্ট্র খুব লাভবান হয়।

কিন্তু কথা হ'চ্ছে বৃহৎ বৃহৎ যন্ত্রের দ্বারা উৎপাদন ব্যবস্থা রাখলেই অর্থ ব্যবস্থার কেন্দ্রীকরণ অনিবার্য হ'য়ে পড়ে। কাজেই কেন্দ্রীকরণের

দোষ তাতে আসা স্বাভাবিক। এইজন্য বিশেষ ক'রে মানুষের মৌলিক আবশ্যকীয় জিনিষ বড় বড় যন্ত্রের দ্বারা হওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক।

৩। ভৌতিক আবশ্যকতা বৃদ্ধির সমর্থকেরা বলে সমাজবাদী অর্থব্যবস্থায় জনসাধারণের মৌলিক আবশ্যকতা পরিপূরণের সঙ্গে সঙ্গে অন্য কৃত্রিম আবশ্যকতা পূরণেরও অবকাশ থাকে। এই ব্যবস্থায় জীবনধারণের মান খুব উচ্চ করা যায়।

কেন্দ্রীয় অর্থব্যবস্থার বর্ণনায় এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা ক'রেছি।

৪। সমাজবাদী অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের সাধনের উপর রাজসত্তার অধিকার থাকার দরুণ রাজ্যের সকলের লাভ হয়।

সমাজবাদী রাষ্ট্র দেশের আবশ্যকতা অনুযায়ী উৎপাদন করে। সে রাষ্ট্রে শোষণের অবকাশ কম থাকে বা আর্থিক বৈষম্য কম হয় একথা স্বীকার ক'রলেও রাজ্যের বাহিরে অন্য দেশ শোষণ করবার পূর্ণ অবকাশ থাকে। কারণ বড় বড় যন্ত্রপাতির দ্বারা বড় বড় কারখানায় ভূরি উৎপাদনের (Large scale production) উদ্বৃত্ত মাল অনুন্নত দেশে পাঠিয়ে তাকে কাবু করা যেতে পারে।

৫। সমাজবাদী প্রথায় ব্যক্তিত্ব নাশ একটী বড় কথা। (কেন্দ্রীয় ব্যবস্থার আলোচনা দ্রষ্টব্য)

এই ভাবে দেখা যায় একদিকে পুঁজিবাদ এসে মানুষের সামাজিক কর্তব্য এবং দায়িত্ববোধ লোপ ক'রল অন্যদিকে দেখা যায় সমাজবাদ এসে মানুষের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য উড়িয়ে দিতে চাইলো এবং জনতন্ত্রের স্থলে একনায়কত্বের সৃষ্টি ক'রল।

চতুর্থ অধ্যায়

সাম্যবাদ

সাম্যবাদী ব্যবস্থার জন্মের কারণ—

পুঁজিবাদী কেন্দ্রীয় অর্থব্যবস্থা মনে করে যে, যে কোনও রাষ্ট্রীয় অর্থব্যবস্থায় কিছু লোকের বা অধিকাংশ লোকের কল্যাণ সাধনই সম্ভব—জনসাধারণের সকলের কল্যাণ সাধন সম্ভব নয়। সেই নীতি অনুযায়ী এই কেন্দ্রীয় অর্থব্যবস্থায় বুদ্ধিমান এবং সক্ষম ব্যক্তিরাই টিকে থাকতে পারে। (Survival of the fittest) 'শক্তিমানদেরই বেঁচে থাকার অধিকার আছে' এইটিই এই অর্থব্যবস্থার মূল নীতি। আমেরিকা এবং ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ এই নীতি ধ'রেই চলেছে। সে সব জায়গার আর্থিক যোজনার মধ্যবিন্দু হ'চ্ছে যতদূর সম্ভব অধিক সংখ্যক লোকের অধিক কল্যাণ সাধন (Greatest good for the greatest number). এই ব্যবস্থায় সমস্ত মানব সমাজই এক পরিবার এমন ভাবার অবকাশ নাই।

এইপ্রকার অর্থব্যবস্থা পৃথিবীতে অনেকদিন ধ'রে চ'লে আসছে। বহু শতাব্দী ধ'রে এই রকম বৈষম্যপূর্ণ শ্রেণী ব্যবস্থা এবং অনুরূপ পরিবেশে থেকে থেকে মানুষের মনে এমন বদ্ধমূল ধারণা হ'য়ে গেছিল যে ধনী দরিদ্র উচ্চনীচ ভেদ থাকাটাই সত্য বস্তু। কিন্তু এই পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা পৃথিবীতে আর বেশীদিন টিকতে পারছে না। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে তার অবসান হওয়ার সময় ঘনিয়ে এসেছে।

জীবনধারার প্রকাশ ব্যক্তিগত হোক বা গোষ্ঠিগত হোক, সুসংযত

ও স্বচ্ছন্দ হোক বা নাই হোক একটা আদর্শ অবস্থা লাভের প্রচেষ্টা এই জীবনধারার মধ্য দিয়ে অবিরাম চ'লেছে। ঠিক কোন পথে সেই আদর্শে পৌছান যাবে বলা মুস্কিল। ব্যক্তি বা সমাজের বিবর্তনের ভবিষ্যৎ পথটি কি তা নিভুর্ল ভাবে কেউ ব'লতে পারে না। কিন্তু যুগে যুগে মনীষিদের চিন্তা, মনন ও অনুসন্ধান অবিরাম চ'লছে। জগতের চিরন্তন এই ধারায় পুঁজিবাদ বা ধনতন্ত্রের কুফল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য মনীষি মার্ক্স ও লেলিন জগতের সামনে এক নূতন পথ ধ'রলেন। তাঁদের মতবাদকে মোটা কথায় সাম্যবাদ বলা হয়।

সমাজের উপর ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধনতন্ত্রের শোচনীয় পরিণাম মার্ক্স মর্মে মর্মে উপলব্ধি ক'রলেন। তিনি দেখলেন ব্যক্তিগত ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সমাজে কোনও শৃঙ্খলা নাই। সক্ষম অক্ষমকে বুদ্ধিমান বুদ্ধিহীনকে বিশৃঙ্খলভাবে এবং নির্মমভাবে শোষণ ক'রছে। এ দৃশ্য তাঁর প্রাণে বেশ ব্যথা দেয়।

সমাজে সাধারণতঃ অল্প সংখ্যক লোকই বেশী বুদ্ধিমান চতুর বা সক্ষম থাকে। বেশীর ভাগ জনসাধারণ তাদেরই দ্বারা চালিত হয়। এই ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সেই অল্প সংখ্যক লোকই যে যার নিজেদের সুবিধানুযায়ী বহু বংখ্যক জনসাধারণকে শোষণ করে। তাদের কবল থেকে জনসাধারণকে বাঁচাবার জন্য মার্ক্স জগতের সামনে সাম্যবাদের আদর্শ স্থাপন করেন। তিনি দেখাতে চাইলেন ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধনতন্ত্রের স্থলে রাষ্ট্রকেন্দ্রিক বা রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্র কায়েম করেই সমাজকে শোষণমুক্ত করা সম্ভব। তাই তাঁদের সঙ্গে পুঁজিবাদীদের নানা প্রভেদ ও সংঘর্ষের বিষয় থাকা সত্ত্বেও পুঁজিবাদীদের মত তিনি মূলধন ও বৃহদাকার শিল্পব্যবস্থা এবং বৃহদায়তন কৃষির উপর কেন্দ্রীভূত কর্তৃত্ব শক্তিকে খুব বেশী গুরুত্ব দেন। তিনি পুঁজিবাদীদের মত যত বেশী সম্ভব কর্তৃত্ব এবং তার ফলের যত বেশী সম্ভব অংশ গ্রহণ করা

উচিত মনে করেন। তবে সে কর্তৃত্ব ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষের হাতে না থেকে সমাজ বা রাষ্ট্রের হাতে থাকুক এইটিই তিনি চান।

পুঁজিবাদকে একেবারে বিসর্জন দিয়ে সাম্যবাদের নামে সমাজবাদকে বিশুদ্ধ রূপ দেওয়ার চেষ্টা প্রথমে রুশ দেশে হয়। সাম্যবাদের যে রূপই হোক না কেন বর্তমান জগতে রুশই সাম্যবাদের আলোক জ্বালিয়ে রেখেছে।

এই মতবাদ মার্ক্স থেকে জন্ম নিয়ে লেনিনের যুগে খুব পুষ্ট হ'ল। ষ্ট্যালিন তাকে কাজে লাগালেন। এঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে কাজের এবং মতের সম্পূর্ণ মিল না থাকলেও এঁরা সকলেই সমাজ থেকে শাসন ও শোষণ দূর করতে চেয়েছেন এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এই দিক দিয়ে বলা যেতে পারে আবশ্যক পরিবর্তনের দ্বারা সমাজ থেকে আর্থিক এবং রাজনীতিক বৈষম্য দূর ক'রে সাম্য স্থাপন ক'রবার একটী পদ্ধতিই হ'চ্ছে সাম্যবাদ। সাম্যবাদ চায় সমাজের অন্যায় শাসন দূর হোক—সর্বপ্রকার শোষণ বন্ধ হোক।

এইভাবে সাম্যবাদ মানুষের সদিচ্ছার একটি স্পষ্ট অভিব্যক্তি। আদিযুগ থেকে ধর্মপ্রাণ লোকদের দ্বারা কমবেশী প্রায় প্রত্যেক দেশে এই ভাবের অভিব্যক্তি দেখা গেছে। প্রথমে অর্থসমস্যা যখন জটিল ছিল না লোকে যখন ধর্মচর্চা বা সামাজিক রীতিনীতি নিয়ে বেশী নাড়াচাড়া করতেন তখন ধর্মপ্রাণ লোকেরা ধার্মিক বিশৃঙ্খলা বা ধার্মিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে অথবা ধর্মসংস্কারের জন্য আন্দোলন ক'রতেন। এই নিয়ে জগতে কত না মহাপুরুষের জন্ম হয়েছে। পরে ক্রমে অর্থসমস্যার জটিলতা বশতঃ সামাজিক অন্যায় বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উদার হৃদয় ধর্মপ্রাণ লোকেরা ধর্মনীতিক সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনীতিক সংস্কারের উপরও বেশী গুরুত্ব দেন।

আসলে অষ্টাদশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পর ইউরোপের

বিভিন্ন দেশে অর্থনীতিক ক্ষেত্রে নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। সেইজন্য প্রথমে ইউরোপেই নানাপ্রকার 'বাদের' সঙ্গে সঙ্গে সাম্যবাদের জন্ম হয়। সমাজের অর্থনীতিক ক্ষেত্রে প্রথমে কিছু বিশৃঙ্খলা দেখেই ধর্মপ্রাণ লোকদের প্রাণ কাঁদে। যেমন ফ্রান্সে সেণ্ট সাইমন (১৭৬০ খৃঃ অঃ) কারখানার মজুর বা অন্য সাধারণ গরীবদের উপর মিল মালিক ও ধনবানদের অত্যাচার দেখে তাঁর প্রাণে ব্যথা লাগে। তিনি নিছক ধর্মতত্ত্ব বাদ দিয়ে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের দুঃখ কষ্ট লাঘবের জন্য একদিকে সরকার এবং অন্যদিকে বিত্তশালীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিত্তশালীদের ব'ললেন তোমরা সকলের প্রতি ন্যায়োচিত ব্যবহার কর। গরীব এবং মজুরদের জীবনযাপনের ন্যায়োচিত সুযোগ দাও। উৎপন্ন দ্রব্যের ন্যায্য অংশ থেকে তোমরা তাদের বঞ্চিত ক'রো না। আর সরকারকে ব'ললেন আর্থিক ব্যবস্থার সম্পূর্ণ দায়িত্ব তোমরা নাও এবং তোমাদের (সরকারের) সংগঠন খৃষ্ট ধর্মের নীতির আধারেই কর।

ইংলণ্ডে রবার্ট আবনও (১৭৭১—১৮৫৮) এই প্রকার বাণী প্রচার ক'রলেন। ক্রমে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ক্ষিপ্রতার সহিত অর্থসমস্যা এত জটিল হ'য়ে উঠলো যে অল্পদিনের মধ্যেই কার্ল মার্ক্সের (১৮১৮—৮৩) মত মহাপুরুষের মুখ থেকে আর ধর্মসংস্কার সম্বন্ধীয় কোনও কথা বেরোলো না বরং তিনি ধর্মকে একটা কুসংস্কার এবং সামাজিক উন্নতির অন্তরায় স্বরূপ ব'লে প্রচার ক'রলেন। তিনি ধর্মচর্চাকে মদ বা আফিমের নেশার সমপর্যায়ভুক্ত ক'রে দিলেন।

এইভাবে বিশ্লেষণ ক'রলে দেখা যাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পর উদার হৃদয় লোকেরা ধর্মনীতির পরিবর্তনের চেয়ে অর্থনীতির পরিবর্তনে বেশী জোর দেন। অর্থনীতির ক্ষেত্রেই তাঁদের প্রতিভা বেশী প্রকাশ পায়। ক্রমে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং ইউরোপীয়

অর্থনীতির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই নীতি বিভিন্ন দেশে বেশ প্রসার লাভ করে। ভারত এখন সেই অর্থনীতির খপ্পরে।

রুশদেশে সাম্যবাদ—

সাম্রাজ্যবাদের প্রতিক্রিয়া থেকেই সাম্যবাদের জন্ম, উনবিংশ শতাব্দীতে অন্যান্য কয়েকটি দেশের ন্যায় রুশ ও জাপানে সাম্রাজ্যবাদ স্পৃহা খুবই ঘনায়িত হয়। পরিশেষে ১৯০৫ অব্দে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ বাধে। যুদ্ধে রুশ হারে, ক্ষতিও হয় প্রচুর। যুদ্ধের সময় এবং যুদ্ধের শেষে জনসাধারণের—বিশেষ ক'রে মজুর শ্রেণীর দুঃখ চরমে পৌছে। রাজ্যাধিপতি জারের বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ পায়। ক্রমে দিনে দিনে রাজসত্তার বিরুদ্ধে সংগঠন দৃঢ় হয়। ধীরে ধীরে সমস্যা জটিল হ'য়ে উঠে। পরিস্থিতি আয়ত্তে আনা জারের পক্ষে ক্রমে কষ্টকর হ'য়ে উঠছে এমন অবস্থায় ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বা ইউরোপীয় মহাসমর বাধলো। সাম্রাজ্যবাবাদী নীতির ফাঁদে পা দিয়ে রুশ আবার এই যুদ্ধে জড়িয়ে প'ড়ল। ক্ষতির অবধি র'ইল না। 'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘায়ের' মত রুশের দশা হ'ল। চারিদিকে অসন্তোষের অনল দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠলো। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিকরা রাজ্যাধিপতি জার বংশ এবং ধনবান শ্রেণীকে কচুকাটা ক'রে সাম্যবাদ স্থাপনের জন্য সোভিয়েট গণতন্ত্রের (ইউনিয়ন অফ সোস্যালিষ্ট সোভিয়েট রিপাবলিক) স্থাপন ক'রলেন।

অতএব এটা স্পষ্ট যে সাম্যবাদ কোনও স্বতঃস্ফূর্ত বিচার বা স্বয়ংবিচার নয়। সাম্রাজ্যবাদের প্রতিক্রিয়া থেকেই তার জন্ম। কাজেই বিজ্ঞানের স্বাভাবিক নিয়মে সাম্রাজ্যবাদের নাশের সঙ্গে সঙ্গে এই 'বাদের'ও নাশ স্বাভাবিক একথা বলা বোধ হয় ভুল হ'বে না।

সাম্যবাদের দোষগুণ বিচার—

তার নাশ বা তার অস্তিত্বের নির্ণয়ের ভার ভবিষ্যতের উপর ছেড়ে

দিয়ে দেখা দরকার আসলে জগতের দুঃখদারিদ্র দূরীকরণে এবং জগতের মানবীয় স্তর উন্নয়নে এই মতবাদ কতটুকু সহায়ক।

১। সরকারবিহীন সমাজ (Stateless Society)—শাসনবিহীন সমাজ গঠনই সাম্যবাদের অন্যতম আদর্শ। সরকারের অস্তিত্ব লোপ না হওয়া পর্যন্ত পূর্ণ বা বিশুদ্ধ সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। এই আদর্শে পৌছিবার পূর্ব পর্যন্ত যে সরকারকে অবলম্বন ক'রে চলতে হয় তাকে সাম্যবাদী সরকার না ব'লে সমাজবাদী সরকার বা সেইরকম রাষ্ট্রকে সমাজবাদী রাষ্ট্র বলা যেতে পারে। এই হিসাবে এখনো রুশ কেন—পৃথিবীর কোথাও সাম্যবাদী রাষ্ট্র গ'ড়ে উঠেনি। রুশের রাজ্যবিধানেও বোধ হয় 'সাম্যবাদ' শব্দের সমাবেশ সম্ভব হয় নি।

সাম্যবাদীরা বলেন কোনও রাজ্যে বা সমাজে সাম্যবাদের আদর্শে বিপ্লব হ'য়ে যাওয়ার পর উক্ত আদর্শ স্থাপনে যথেষ্ট সময় লাগে। কারণ পুরাতন প্রথা, পুরাতন ধারা, পুরাতন ব্যবস্থা এবং পুরাতন সংস্কার ভেঙ্গে সম্পূর্ণ নূতন বা পুরাতনের বিপরীত ধারায় আনা অত্যন্ত কঠিন, জটিল এবং সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। এই রকম কঠিন কাজ ততদিন পর্যন্ত কোনও শক্ত সরকারের নিয়ন্ত্রণ ব্যতিরেকে সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব। সেইজন্য বিপ্লবের পর প্রথমাবস্থায় একটি সুসংগঠিত সরকার গঠন একান্ত আবশ্যক হ'য়ে পড়ে।

কিন্তু প্রশ্ন আসে সরকারকে এইভাবে সুগঠিত ক'রে কি শাসনবিহীন সমাজ গঠন সম্ভব? এটা ঠিক বৈজ্ঞানিক নিয়ম অনুযায়ী পূর্ণতা প্রাপ্তির পর বস্তুর অস্তিত্ব লোপ পায়। সেই হিসাবে বলা যেতে পারে সরকার পূর্ণভাবে সংগঠিত হ'লে তারও অস্তিত্ব লোপ পাবে। কিন্তু অস্তিত্ব লোপ পাওয়ার পর সাম্যবাদী সমাজই গঠিত হবে তার কোনও নিশ্চয়তা বা কোনও বৈজ্ঞানিক নিয়ম আছে কি? কোনও সমাজে সরকার না থাকা মানে ত সাম্যবাদী সমাজ নয়? অরাজক সমাজ ও হ'তে পারে।

যদি ধ'রে নওয়া যায় যে সমাজকে সুখী এবং সম্পন্ন করবার জন্য বা সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখবার জন্য অথবা সমাজের নৈতিক স্তর উন্নয়নের জন্য কিছু উদার হৃদয় লোক অথবা এক শ্রেণীর প্রাণবান লোকের দ্বারা একটী সুদৃঢ় সরকার গঠিত হওয়া দরকার তাহলে তাঁদের অন্তে তাঁদের স্থলে সেইরকম লোক আসবার কোনও নিশ্চয়তা আছে কি ? তা যদি না হয়—যেহেতু তাঁরা উদারহৃদয় বা প্রাণবান্ লোক কাজেই তাঁদের সুদৃঢ় শাসনের পর সাম্যবাদী সরকারের স্থাপনা হবে এমন কোন বৈজ্ঞানিক বা আধ্যাত্মিক নিয়ম আছে কি ? তা যদি হত তাহলে পৃথিবীর নানা দেশে এ পর্যন্ত অনেক সরকার বিহীন সমাজ বা সাম্যবাদী সমাজ গ'ড়ে উঠতো।

তৃতীয়তঃ এই সুদৃঢ়তার (Consolidation এর) সীমা কতদূর ? ঠিক কোন অবস্থায় গিয়ে এই সুদৃঢ়তা পূর্ণ হবে এবং এই সুদৃঢ়তার পর সরকারের বিলোপ আরম্ভ হবে তার কোনও সুস্পষ্ট চিত্র সাম্যবাদী পরিকল্পনায় আছে কি ? থাকা সম্ভব নয়। কাজেই সুদৃঢ়ীকরণের এই ক্রম ততদিন জারি রাখতে হয় বা সুদৃঢ়ীকরণ আরও কষে ক'রে যেতে হয় যতদিন না আপনা আপনি সরকারের বিলোপ হয়। এই রকম অবস্থায় অনিশ্চয়তার উপর ভরসা ক'রে রাষ্ট্রতরণী চালিয়ে যেতে হয়। হয় ত তর্কের খাতিরে বলা যেতে পারে কলকাতা থেকে দিল্লী যেতে হ'লে পূর্বমুখে যাত্রা ক'রেও দিল্লী পৌছান যায় কেননা পৃথিবী গোল। কিন্তু সে ভাবে কি কেউ যাত্রা করে ?

এই রকম অনিশ্চিত সময়ের জন্য যতদিন না রাজ্যবিলোপ হচ্ছে জনসাধারণকে কেন্দ্রীয় সত্তাজনিত দুর্ভোগ ভোগ করতে হয়। একদিকে শাসনের চাপ পড়তে থাকে অন্যদিকে দিনে দিনে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য লোপ পেতে থাকে। এই ভাবে সরকারবিহীন সমাজগঠন একটা ভিত্তিবিহীন কল্পনা। অবশ্য প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে একদিন

এই প্রকার সুদৃঢ় রাজ্যের বিলোপ হবেই। পৃথিবীতে কেন্দ্রীয় সত্তা-সম্পন্ন অনেক রাজ্যের বিলোপ হয়েছে—তা ফাসিষ্ট রাজ্য হোক, নাজী-রাজ্য হোক, জার রাজ্য অথবা বিশাল রোম গ্রীস্ সাম্রাজ্যই হোক। সর্বত্রই ধ্বংসের মূলে দেখা গেছে কেন্দ্রীয় সত্তার সুদৃঢ়ীকরণ এবং সত্তার নিরঙ্কুশ শাসন। কাজেই এই নিয়মে সাম্যবাদী রাষ্ট্রের সেই দশা হবে না একথা কি বলা যায়? কিন্তু তার বিলোপের পর সাম্যবাদ পরিকল্পিত সরকারবিহীন সমাজ গঠিত হবে একথা বলার কোনও আধার নাই।

আসলে সরকারবিহীন সমাজ রাজ্যের আবশ্যকতা ক্রমশঃ কম ক'রেই গড়া সম্ভব এবং এই রকম কিছু গড়ার ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। সরকারের আবশ্যকতা কম ক'রতে হ'লে প্রথম থেকেই স্বাবলম্বনের উপর সমাজের ভিত্তি স্থাপন ক'রতে হয় এবং ব্যক্তির নেতৃত্ব-শক্তির বিকাশের সুযোগ দিতে হয়। (গান্ধীজীর গ্রামরাজ্য বিষয়ক আলোচনায় এবিষয় আরও স্পষ্ট হবে)।

২। বর্গহীন (শ্রেণীহীন) সমাজ (Classless Socity) :—

প্রথম কথা কেন্দ্রীয় সত্তামূলক রাজ্য-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক বর্গ (আমলাবর্গ) এবং ব্যবস্থাধীন বর্গ (শ্রমিক বর্গ) নামে দুটী বর্গ থাকেই। কেন্দ্রীয় রাজসত্তার সঙ্গে এই দুটী ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। এই রকম রাষ্ট্রকে যতই জনতন্ত্র মূলক বলা হোক না কেন তা জনতন্ত্র মূলক হ'তেই পারে না। কেন্দ্রীয় রাজসত্তা এই ব্যবস্থাপকবর্গের হাতেই জড়িয়ে থাকে। ক্ষেত্র বা পাত্রবিশেষে তার সদুপযোগ বা দুরুপযোগ হ'তে পারে কিন্তু আসলে থাকে ওদেরই হাতে। প্রকৃত পক্ষে সরকার বলতে তারাই।

এখানে বলা যেতে পারে সাম্যবাদী সমাজ-ব্যবস্থায় ব্যবস্থাপকেরা (আমলারা) যদি সত্তার সদুপযোগ করে বা ইংলণ্ডের রাজার মত

নামেই সত্তাধিকারী হয় তাহলে ক্ষতিই বা কি ? তখন প্রশ্ন আসে সেই রকম অবস্থায় সাম্যবাদী সমাজে তেমন সত্তাধিকারীর আবশ্যকতাই বা কি ? সে অবস্থায় সহজেই সরকারবিহীন সমাজের দর্শন হ'তে পারে। কিন্তু সাম্যবাদী পদ্ধতি তা নয়। তারা রাজসত্তাকে ক্রমশঃ সুদৃঢ় করতে চায়। সত্তার সুদূরীকরণ এবং বিলীনীকরণ দুটো একসঙ্গে চলতে পারে না। কাজেই রাজসত্তার সুদৃঢ়ীকরণের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থাপক বর্গেরও সুদূরীকরণ হ'তে থাকে। এইভাবে একদিকে সুব্যবস্থিত পাকা ব্যবস্থাপক বর্গ (আমলাবর্গ) এবং অন্যদিকে সুনিয়ন্ত্রিত শ্রমিক বর্গ নিয়ে রাজ্যের রথ চলতে থাকে।

সাধারণ গণতান্ত্রিক পুঁজিবাদী রাজ্যের শ্রমিক বর্গের সঙ্গে সন্ধিকালীন (Transitional period) সাম্যবাদী রাজ্যের শ্রমিকবর্গের তুলনা ক'রলে দেখা যাবে সাম্যবাদী রাজ্যের শ্রমিকদের অবস্থা পুঁজিবাদী রাজ্যের শ্রমিকদের তুলনায় অতীব শোচনীয়। কারণ গণতান্ত্রিক পুজিবাদীরাজ্যে শ্রমিকদের যতটুকু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অবকাশ থাকে সাম্যবাদীরাজ্যের শ্রমিকদের তা থাকে না। পুঁজিবাদী রাজ্যে শ্রমিকেরা অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিভার বিকাশ করবার সুযোগ পায় তাছাড়া পুঁজিবাদীরাজ্যে শ্রমিকসংঘ ইত্যাদির দ্বারা শ্রমিকদের সংগঠিত ক'রে তাদের ন্যায্যদাবি আদায় করবার অধিকার থাকে কিন্তু সাম্যবাদীরাজ্যে ব্যবস্থাপক বর্গের বিরুদ্ধে টুঁ শব্দ করবারও কারও অধিকার থাকে না।

আর এক কথা। উৎপন্ন বস্তুর বিতরণ ব্যাপারে তাদের ধারা অনুযায়ী যতদিন না সকলে উপার্জন ক্ষমতায় সমপর্যায়ে আসতে পারে ততদিন আয়ের বৈষম্য থাকবেই। আয়ের বৈষম্য থাকলেই উচ্চনীচ ভেদ, পদবৈষম্য এবং শ্রেণীবৈষম্য থাকতে বাধ্য—তা পুঁজিপতিবর্গ এবং শ্রমিকবর্গ নামে নাই হোক ব্যবস্থাপকবর্গ এবং শ্রমিকবর্গ নামেই

থাকবে। উভয় শ্রেণীর বেতনে পার্থক্য, বসন-ভূষণে পার্থক্য, আবাস-ভোজনে পার্থক্য—এইভাবে জীবনের সর্বক্ষেত্রে এক বর্গের সঙ্গে অন্য বর্গের পার্থক্য থাকবেই।

সাম্যবাদী অর্থব্যবস্থার মোটামুটি সূত্র নিম্নপ্রকার ঃ—

১। সর্বপ্রকার ভৌতিক সুখ-সমৃদ্ধির প্রাচুর্য লাভই এই উৎপাদন ব্যবস্থার লক্ষ্য।

২। সর্বপ্রকার রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানা না থাকা।

৩। জীবিকার জন্য ব্যক্তিগত ব্যবস্থায় বৃত্তি অবলম্বিত না হ'য়ে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় নির্দ্ধারিত ও নির্দেশিত হওয়া।

৪। উৎপাদনের সর্বপ্রকার সাধন (জমি, খনি, সমুদ্র, কল-কারখানা ইত্যাদি) ও সর্বপ্রকার সরঞ্জাম (যন্ত্রপাতি ইত্যাদি) রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রিত হওয়া।

৫। সর্বপ্রকার উৎপাদন-ব্যবস্থা ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতির ভিত্তিতে বিবেচিত না হ'য়ে রাষ্ট্রীয় লাভ-ক্ষতির ভিত্তিতেই বিবেচিত হওয়া।

৬। সর্বপ্রকার উৎপাদন ব্যবস্থা (পরিমাণ বহুল) (Large-scale) ভূরি উৎপাদনের দৃষ্টিতে হওয়া।

৭। রাষ্ট্র নির্দিষ্ট ব্যবস্থায় কাজ করা এবং রাষ্ট্র নির্দিষ্ট হারে ভাতা লওয়া।

এই ভাবে পুঁজিবাদ ও সাম্যবাদ বিশ্লেষণ ক'রলে সূত্রাকারে আমরা নিম্নলিখিত জিনিষ পাব।

পুঁজিবাদী ও সাম্যবাদী ব্যবস্থার পার্থক্য ও সমতা :—

১। প্রথমতঃ সর্বপ্রকার ভৌতিক সুখ-সমৃদ্ধির প্রাচুর্য্য লাভই উভয় ব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য।

২। সাম্যবাদী ব্যবস্থার তুলনায় পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ধনবৈষম্যের

অবকাশ বেশী। এই জন্য ধনবান শ্রেণীর দ্বারা গরীব শ্রেণীর শোষিত হওয়ার সম্ভাবনাও যথেষ্ট বেশী।

৩। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদন আদি প্রত্যেক ক্ষেত্রে দৃষ্টি থাকে ব্যক্তিগত লাভের দিকে, কিন্তু সাম্যবাদী ব্যবস্থায় দৃষ্টি থাকে রাষ্ট্রীয় লাভের দিকে।

৪। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির বা এক শ্রেণীর সঙ্গে অপর শ্রেণীর প্রতিযোগিতা প্রধানতঃ আর্থিক ক্ষেত্রে চলে কিন্তু সাম্যবাদী ব্যবস্থায় সেই রকম প্রতিযোগিতা প্রধানতঃ রাজনীতিক ক্ষেত্রে চলে।

৫। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের যেমন অবকাশ থাকে সাম্যবাদী ব্যবস্থায় তেমন থাকা সম্ভব নয়।

৬। উভয় ব্যবস্থাতেই শ্রেণী বিরোধের অবসান বা শ্রেণীহীন সমাজ গঠিত হ'তে পারে না। সাম্যবাদী ব্যবস্থায় রাজা নামে কোনও শাসক থাকে না বটে কিন্তু রাজার স্থলে প্রেসিডেন্ট নাম দিয়ে শাসনব্যবস্থা চালাবার মত অবস্থা দাঁড়ায়। রাজার স্থলে নূতন শাসক ও তার সঙ্গে সঙ্গে নূতন আমলার দল, নূতন প্রিয়-পাত্রের দল এইভাবে একটা নূতন মধ্যবিত্ত সমাজ দেখা দেয়। জমি ও সম্পদের উপর সেই নূতন শাসক ও পরামর্শ দাতাদের কর্ত্তৃত্ব আসে। সৈন্যাধ্যক্ষের হাতে সামরিক কর্তৃত্ব, কারখানা পরিচালনায় বিশেষজ্ঞদের কর্তৃত্ব এবং শ্রমিকের শ্রমে এই সমস্ত অধিকারী ও কর্ম-কর্তাদের কর্তৃত্ব পূর্ববৎ চলতে থাকে।

পঞ্চম অধ্যায়

গান্ধীজী ও সর্বোদয় অর্থনীতি

গান্ধীজীর মনন

এই গেল পুঁজীবাদ, সমাজবাদ ও সাম্যবাদের মোটামুটি রূপ এবং মার্ক্স আদি মহাপুরুষের তত্ত্বকথা। তাঁদের ঠিক অব্যবহিত পরেই মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব হয়। জগতের ধারায় তাঁদের মতবাদ কতটা উপযোগী তা তিনি মনন করেন। তিনি দেখলেন এ পর্য্যন্ত অনুসন্ধিৎসুগণ জনগণের সুখের সন্ধানে ভুলে আলেয়ার পেছুনে ছুটেছেন। তাঁরা মনুষ্যজীবনের মূলতত্ত্ব থেকে অনেক দূরে স'রে গেছেন। তাঁর মনন নিম্নপ্রকার—

১। মানুষের শ্রেষ্ঠতা :—

প্রকৃতির কোলে মানুষই শ্রেষ্ঠ জীব 'ন মানুষাৎ শ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ' একথা তাঁরা ভুলে গেছেন। মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব তার দৈহিক গঠনে নয় বা দৈহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যভোগে নয় তার শ্রেষ্ঠত্ব তার মনুষ্যত্বের বিকাশে বা তার আত্মবিকাশে। দয়া, স্নেহ, ক্ষমা, বাৎসল্য, প্রেম, প্রীতি, সৌহার্দ্য ইত্যাদি মানবীয় গুণের বিকাশই মনুষ্যত্বের বিকাশ। মনুষ্যত্বের চরম বিকাশই দেবত্ব। মানুষই দেবত্ব প্রাপ্তির যোগ্য। প্রকৃতি অন্য কোনও জীবকে এই যোগ্যতা লাভের সুযোগ দেয়নি। অন্যান্য জীবের জীবনের কোনও উদ্দেশ্য নাই। কিন্তু মনুষ্যজীবনের একটি লক্ষ্য আছে। দেবত্ব-প্রাপ্তি বা চরম আধ্যাত্মিক বিকাশই সেই লক্ষ্য। সেই মূল লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্যই সমস্ত অর্থ ব্যবস্থা, রাজব্যবস্থা ও সমাজ-ব্যবস্থা। এই মূল লক্ষ্য থেকে যে ব্যবস্থা যত দূরে যাবে মানবের প্রকৃত সুখ সাধনে বা মানবকে উন্নত স্তরে আনয়নে ততই অকৃতকার্য্য হবে।

২। ধর্মনীতি ও অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ—

অতীত সমাজ-সেবকগণ জীবনের মূলনীতি (ধর্মনীতি) কে অর্থনীতি বা রাজনীতি থেকে পৃথক ক'রে দেখেছেন। তাঁরা মনে করেছেন রাজনীতি ও অর্থনীতির সঙ্গে ধর্মনীতির কোনও সম্বন্ধ নাই। তাঁদের অর্থশাস্ত্রে 'যঃ অর্থশুচি সঃ শুচি' এই তত্ত্বের কোনও স্থান নাই। তাঁরা মনে করেছেন ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা ইত্যাদি ব্যক্তিগত ব্যাপার। সংসার-ত্যাগীদের পক্ষে তা প্রযোজ্য। সাংসারিক জীবনে বা সামূহিক ভাবে তার প্রয়োগ সম্ভব নয়। সাংসারিক জীবনে আবশ্যক ক্ষেত্রে অধর্ম বা অসত্যের আশ্রয় লওয়া দোষণীয় নয়।

এ ছাড়া এমন সমাজ সংস্কারকও এসেছেন যাঁরা ব্যক্তিজীবন, সমাজজীবন বা মনুষ্যজীবনের কোনও ক্ষেত্রে ধর্ম বা নীতির আবশ্যকতা উপলব্ধি করেন নি। তাঁরা ধর্ম বা সত্য ইত্যাদিকে কু-সংস্কার ব'লে একেবারে উড়িয়ে দিয়েছেন।

এ পর্য্যন্ত এই ভাবে প্রায় সকলেই অর্থনীতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে অসত্য বা অধর্মকে দোষণীয় মনে করেন নি। ফলে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে অর্থনীতিক এবং রাজনীতিক জীবনে অধর্ম এবং অসত্য ক্রমে বেড়ে চলেছে এবং যেহেতু রাজনীতি ও ধর্মনীতি সম্পূর্ণ জীবননীতি থেকে অবিভাজ্য কাজেই অসত্য এবং অধর্ম আজ সম্পূর্ণ মানব জীবনকে গ্রাস করেছে। মানবজীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে—এমনকি ধর্মের ক্ষেত্রেও। অসত্য এবং অধর্মের পরিবেশে মানবভোগ্য স্বর্গীয় সুখ কি সম্ভব? আসলে ধর্মনীতি এবং অর্থনীতি একই জীবননীতির দুই দিক।

৩। আধ্যাত্মিক উন্নতিই আসল উন্নতি—

তাঁরা ভৌতিক সুখ এবং ভৌতিক আবশ্যকতাকেই প্রধান স্থান দিয়েছেন এবং তারই ভিত্তিতে রাজব্যবস্থা এবং অর্থব্যবস্থার কাঠামো দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছেন।

কোনও প্রকার ভৌতিক শ্রীবৃদ্ধি মানুষকে সুখী করতে পারে না। আমরা অহরহঃ দেখতে পাই বিশাল অট্টালিকাবাসী অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী অসংখ্য লোকের জীবন অনীতি, অনাচার, অশান্তি এবং উদ্বেগ ভরা। আবার দেখা যায় গাছতলা বা পর্ণকুটীরবাসী কপর্দকহীন অসংখ্য লোকের জীবন উদ্বেগবিহীন—নীতি, ধর্ম এবং শান্তিপূর্ণ। কাজেই মানুষকে সুখী করবার জন্য ভৌতিক শ্রীবৃদ্ধির পেছুনে দৌড়ান—মৃগতৃষ্ণিকার পেছুনে দৌড়ান ছাড়া আর কিছুই নয়। দ্বিতীয়তঃ ভৌতিক আবশ্যকতার কোনও সীমা বাঁধা যায় না। যতই বাড়ান যায় ততই বাড়ে। যতই বাড়ে লোককে তার পিছুনে ততই বিব্রত থাকতে হয়। ফলে মানুষের আসল কাজ ততই বাদ পড়ে যায়। আসল লক্ষ্যপথ থেকে মানুষ ততই দূরে সরে যায়। তৃতীয়তঃ মানুষের জীবন ভৌতিক আবশ্যকতাপ্রবণ হওয়ার পর থেকেই প্রাকৃতিক সম্পদের উপর ব্যক্তিগত মালিকানার ভাব দৃঢ়ীভূত হয়। স্থায়ী বসবাস আরম্ভ হয়। স্থায়ী বসবাসের জন্য স্থান বা ক্ষেত্র নির্বাচন করতে হয়। তার উপভোগ্যবস্তু নিজের অধিকারে রাখার প্রশ্ন আসে।

এই সমস্ত নিয়ে পরস্পরে টানাটানি কামড়া-কামড়ি চলে। এই থেকেই রাজা বা রাজব্যবস্থার সৃষ্টি। এই ভৌতিক আবশ্যকতা যতই বাড়ান যায় ব্যক্তিগত মালিকানা ততই দৃঢ় হয় এবং ততই রাজ-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা অনিবার্য্য হ'য়ে উঠে। কাজেই ভৌতিক আবশ্যকতা-প্রবণ পরিবেশে ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ বা সরকারবিহীন সমাজ-গঠনের প্রয়াস সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক এবং প্রাকৃতিক নিয়মবিরুদ্ধ। আবশ্যকতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সরকারের আকার এবং শক্তি উভয়ই বেড়ে চলবে। পৃথিবীর প্রত্যেক রাষ্ট্রই এই সত্যের জ্বলন্ত উদাহরণ।

চতুর্থতঃ ভৌতিক আবশ্যকতা যতই বাড়ে তার পূরণের জন্য ততই ক্ষেত্র বিস্তার ক'রতে হয় এবং ব্যবস্থার জটিলতাও ততই বাড়ে। দেশে

ক্রমে এক ব্যপস্থাপক বর্গের সৃষ্টি হয় যারা জনসাধারণের সমস্ত আবশ্যকীয় বস্তুর ব্যবস্থা করে এবং জনসাধারণ এই বর্গের বোঝা ব'য়ে চলে। দৈনন্দিন আবশ্যকীয় বস্তুর উৎপাদন এবং বিতরণাদির জন্য এই ব্যবস্থাপকবর্গের উপর নির্ভর ক'রতে ক'রতে এমন সময় আসে যখন জনসাধারণ এই বর্গের হাতের পুতুল হ'য়ে দাঁড়ায় আর এরা যেমন ইচ্ছা তাদের নাচাতে থাকে। ব্যবস্থার নামে শোষণ চলে।

এই ব্যবস্থাপক বর্গকেই আমরা সরকার বলি। ক্রমে সরকার শক্তিশালী হয়। সরকারের বিধান শক্ত হয়। বিধান যতই শক্ত হয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ততই ক্ষুণ্ণ হয়। তখন শাসন এবং শোষণ উভয়ই পুরোমাত্রায় চলে। পঞ্চমতঃ লোকে বিজ্ঞানকে ভৌতিক আবশ্যকতা পরিপূরণের অস্ত্ররূপে গ্রহণ করেছে। ভৌতিক আবশ্যকতা হু হু ক'রে বেড়ে চলেছে। বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক এবং রাজনীতিক ব্যবস্থা ক্রমশঃ সংগঠিত এবং কেন্দ্রীকৃত করতে হচ্ছে। বলা বাহুল্য কেন্দ্রীকৃত ব্যবস্থায় শাসন ও শোষণের পূর্ণ অবকাশ থাকে।

৪। প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অধিকারস্পৃহা :—

সমাজসেবকগণ দেখলেন প্রাকৃতিক সম্পদ এবং (মানুষের আবশ্যকীয় জিনিষের) উৎপাদনের অধিকার যার হাতে, জনসাধারণের জীবনের চাবি তার হাতে। তখন তারা এই রাষ্ট্রীয় অধিকার হস্তান্তরের দিকে ঝুঁকে পড়লেন এবং সেই অধিকার এমন বর্গের হাতে দিতে চাইলেন যারা জনসাধারণকে সর্বপ্রকার ঐহিক সুখের অধিকারী ক'রতে পারে। তাঁরা মনে করলেন অধিকারের ব্যবস্থা ক'রতে পারলে সমাজে স্থায়ী শান্তি ও শৃঙ্খলা আনা সহজ হবে। প্রাকৃতিক সম্পদের উপর এই প্রকার অধিকারস্পৃহা থেকেই রাজতন্ত্রের সৃষ্টি। অধিকারের সংগঠিত রূপই সরকার, রাজতন্ত্র বা রাজসত্তা। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমাজসেবকগণ এই মূল কথা ভুলে রাজতন্ত্রের বলে বা রাজাধিকার

বলে জনগণের দুঃখ দারিদ্র্য দূর করবার চেষ্টা ক'রে আসছেন। ফলে গদি অধিকারের চিরন্তন টানাটানি চলছে। বিভিন্ন মতের বিভিন্ন দল সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন দল বিভিন্ন নামে রাজসত্তা হাতে লওয়ার চেষ্টা করছে। অধিকারের নিত্য ট্যাগ্ অফ্ ওয়ার চলছে। অনেক মারামারি কাটাকাটি হচ্ছে। এই নিয়ে নানা প্রকার রাজতন্ত্রের সৃষ্টি হয়েছে। ফলে দেশ কাল পাত্রভেদে অধিকার কখনও পুঁজিপতির হাতে কখনও নিরঙ্কুশ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তির হাতে আর কখনও বা বিরাট শক্তিশালী ব্যবস্থাপকবর্গের হাতে আছে। এ ছাড়া আর এক শ্রেণীর সমাজসেবক আছেন যাঁরা মনে করেন উৎপাদক সর্বহারা শ্রেণীদের হাতে কর্তৃত্ব-শক্তি এসে গেলেই জনগণ সর্বপ্রকার সুখের অধিকারী হ'তে পারবে। এইভাবে অধিকারের চিরন্তন দ্বন্দ্ব চ'লে আসছে।

আর্থিক ক্ষেত্রে দেখি ব্যক্তিগত পুঁজিবাদ ক্রমে সংঘবদ্ধ রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদে বা রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্রে পর্য্যবসিত। পুঁজিহীনেরা শোষিত ও বিপর্য্যস্ত। সমাজব্যবস্থা রাজব্যবস্থার সঙ্গে আষ্টেপৃষ্টে জড়িত। শিথিল রাজব্যবস্থা ক্রমে নিরঙ্কুশতায় পরিণত। শাসনের চাপে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নির্মমভাবে নিষ্পেষিত। এই ভাবে শাসন ও শোষণের কষাকষিতে আজ মানবজীবন জর্জরিত।

তাঁরা মনে করেন নি লোভ হিংসা আদি অহিতকারীবৃত্তির মত অধিকারস্পৃহা ও ব্যক্তি এবং সমাজ উভয়ের পক্ষে অহিতকর। তাঁরা সমাজে অধিকারস্পৃহা জাগিয়েছেন। ব্যক্তিগত এবং সংঘবদ্ধভাবে জনজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অধিকার জাগাবার চেষ্টা করেছে। যখন যার সুযোগ হয়েছে বা যখন যে সুযোগ করতে পেরেছে অধিকার হস্তগত করেছে এবং ভৌতিক সুখই জীবনের কাম্য হওয়ার দরুন অধিকার বলে লোকে নিজেদের ভৌতিক সুখ বাড়াবার চেষ্টা করেছে। এই চেষ্টায় ভায়ে-ভায়ে, পিতাপুত্রে, জ্ঞাতি-গোত্রে, দেশে-দেশে

মারামারি কাটাকাটির চির দাবানল জলছে। এই চেষ্টায় রাজ্যের জনগণ কখন ব্যক্তির হাতে কখনও মুষ্টিমেয় লোকের মুঠার মধ্যে প'ড়ে নানাভাবে শোষিত হচ্ছে। কখনও একদেশ অন্যদেশের কবলে প'ড়ে নানাভাবে শোষিত, শাসিত এবং লুণ্ঠিত হচ্ছে। অতএব এই স্পৃহার আধারে বা এই স্পৃহাকে গুরুত্ব দিয়ে অথবা এই স্পৃহাকে কায়েম রাখার অনুকূলে যে কোনও প্রকার সমাজব্যবস্থা জনসুখের অন্তরায় হবে এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। গভীর মননের পর তিনি এইভাবে মানবজীবন এবং মানবসমাজের অতীত এবং বর্ত্তমান স্থিতির আরও উন্নততর নিরাবিল সুখের সন্ধানে লাগা তিনি দরকার মনে করেন। তাঁর চোখে যে জগতের শুধু এই ধনতান্ত্রিক বৈষম্য ঠ্যাকে তা নয় রাজতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক বৈষম্য দেখেও তাঁর প্রাণ কাঁদে। তিনি সারাজীবন এই বৈষম্য দূরীকরণের উপায় উদ্ভাবনে আত্মনিয়োগ করেন এবং পুঁজিবাদ ও সাম্যবাদ থেকে অনেক উন্নত একটি সর্বমঙ্গলদায়ক ও সর্বহিতসাধক অর্থব্যবস্থা আমাদের সামনে ধরেন। তাঁর অর্থনীতির মোটামুটি সূত্র নিম্নপ্রকার—

গান্ধীজীর অর্থনীতির মূল সূত্র

১। মানবজীবনের একটা লক্ষ্য আছে। চরম আধ্যাত্মিক উন্নতিই সেই লক্ষ্য। সেই মূল লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্যই, সমস্ত অর্থব্যবস্থা।

অর্থব্যবস্থা জীবনের ভৌতিক দিক মাত্র। জীবনে ভৌতিক আবশ্যকতার স্থান ততটুকু যতটুকু হ'লে আধ্যাত্মিক লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়া সহজ ও সরল হয়।

২। সামাজিক, আর্থিক ও রাজনীতিক সমস্ত ব্যবস্থাই ব্যক্তিকে কেন্দ্র ক'রে। ব্যক্তিকে তার চরম লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়ার জন্যই এই সব। ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্যই সমাজ—সমাজের জন্য ব্যক্তি নয়।

ব্যক্তির জন্যই জাতীয় অর্থব্যবস্থা—জাতীয় অর্থব্যবস্থার জন্য ব্যক্তি নয়। ব্যক্তি মানে সমাজের প্রত্যেক বক্তি।

৩। সর্বাধিক সুখ সকলের জন্যই—কোনও ব্যক্তি বা সম্প্রদায়-বিশেষের জন্য নয়।

৪। ঈশা-বাস্যমিদম্ সর্বম্ যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগত, 'সীয়া রামময় সব জীব জানি' এই দৃষ্টি। ভগবান সর্বব্যাপী—সৃষ্ট জীব মাত্রই ভগবানের অংশ। আধ্যাত্মিক লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য ভগবানের সৃষ্ট পদার্থ আমার ততটুকুই গ্রহণ করা দরকার যতটুকু অপরের পক্ষেও গ্রহণ করা সম্ভব।

সর্বে অত্র সুখিনঃ সন্তু সর্বে সন্তু নিরাময়া
সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখমাপ্নুয়াৎঃ।

অর্থ ব্যবস্থা এমন হবে যাতে ব্যক্তিমাত্রেরই সুখী হওয়ার সমান অবকাশ থাকে।

৫। পবিত্র সিদ্ধি প্রাপ্তির জন্য সাধনেরও পবিত্রতা একান্ত দরকার।

৬। ন্যাসবাদ—মানুষের শরীর, মন বুদ্ধি এবং মানসিক প্রতিভা বলতে যা কিছু তার জমিজমা, ঘরবাড়ী, ধনদৌলত ইত্যাদি ধর্ত্তব্য ও হস্তান্তরযোগ্য সম্পদ বলতে যা কিছু সবই তার ন্যস্ত সম্পত্তি। এগুলির সে মালিক নয়—অছি মাত্র। এগুলির মালিক ভগবান।

এই হিসাবে ব্যক্তিগত বা সাধারণ সম্পত্তি ব'লে কোনও প্রভেদ নাই। প্রেম এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি পরস্পর বিরোধী। পূর্ণ প্রেম হ'লেই পূর্ণ অপরিগ্রহ হবে। ব্যক্তির ভৌতিক বা আধ্যাত্মিক যা কিছু সম্পদ সবই ভগবানের—অর্থাৎ সমাজের। সমাজের সেবার জন্যই বা সমাজের চরণে অর্পণ করবার জন্যই সব কিছু। সমাজের হিতেই নিজের হিত নিহিত।

সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানা এলেই সমাজে হিতবিরোধের সৃষ্টি হয়। প্রথমতঃ মানুষ লোভ, স্বার্থ ও অহঙ্কারের দ্বারা চালিত না হ'য়ে

কর্ত্তব্যবুদ্ধির দ্বারা চালিত হবে এবং স্ব স্ব কর্ম সম্পাদন করবে। দ্বিতীয়তঃ তার অধিগত সম্পত্তি, কর্ত্তৃত্ব, পদাধিকার, বিদ্যা, কর্মকুশলতা, শরীর শক্তি ইত্যাদি অথবা শিশু, আতুর বা অন্য আশ্রিতদের অভিভাবকত্ব—এসকলই ন্যস্ত দায়িত্বরূপে প্রয়োগ করবে এবং নিজেকে ঐ সকলের প্রভু না ভেবে ন্যাস বা অছি মাত্র মনে করবে। এই ন্যাস-বুদ্ধি জাগ্রত হ'লেই মানুষ অভিভাবকত্বের সুপ্রয়োগ করতে পারে। তখন সে পদের বা দায়িত্বের সুযোগ নিয়ে নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করে না অথবা অতিরিক্ত উপস্বত্ব গ্রহণ করে না। তখন সে শক্তিমত সেবাদান করে এবং একজন অপরিগ্রহ হিসাবে ও সমাজের কতটা সামর্থ্য তা বুঝে নিজের সংক্ষিপ্ত প্রয়োজনমত ন্যায্য জীবিকা যোগ্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করে।

কেবল অর্থনীতিই জীবনের সব কিছু নয়। তিনি ব্যক্তি এবং সমাজের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য সমাজের এক নূতন আদর্শ আমাদের সামনে ধরলেন সে হচ্ছে সর্বোদয় সমাজ। এ পর্যন্ত এর চেয়ে উন্নতস্তরের সমাজ-ব্যবস্থার পরিকল্পনা হয় নি। কেবলমাত্র এই ব্যবস্থার দ্বারাই এই ধ্বংসোন্মুখ পৃথিবীর রক্ষা সম্ভব।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সর্বোদয়

সর্বোদয় বিচার—

জগতকে সুখময় ও শান্তিময় ক'রে তুলবার সত্যের উপর অধিষ্ঠিত এক ভাবধারাই সর্বোদয়। জগতে সুখের সন্ধান অব্যাহত গতিতে চলেছে। ব্যক্তিগত, শ্রেণীগত এবং রাষ্ট্রগত সুখ, ভৌতিক এবং

আধ্যাত্মিক সুখ–সর্ব প্রকার সুখ। দেশকাল পাত্র ভেদে কখনও কোনটায় গুরুত্ব বেশী পড়েছে কখনও কোনটায় কম কিন্তু চলেছে অব্যাহত গতিতে। এই বিশাল বিশ্বে এই কাজে অনেক বীর পুরুষ এবং অনেক মহাপুরুষের আবির্ভাব তিরোভাব হয়েছে; ছোটবড় অনেক রাজ্য ভেঙেছে গড়েছে। এই ভাঙ্গাগড়ার মধ্যদিয়ে বিশ্ব এগিয়ে চলেছে না জানি কোথায় কোন অন্তরের পথে!

পৃথিবীতে নানা মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। এক এক সময় এক এক মতবাদ এক এক দেশে এবং এক এক জাতিকে মাতিয়ে তুলেছে। দু'দিন পরে আবার সে মতবাদ লোপ পেয়েছে। যুগে যুগে এই সন্ধানের কাজে নানা ভাঙ্গাগড়া এবং উত্থান পতনের মধ্যে একটি জিনিষ বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে সত্যাশ্রিত কোনও বিচার বা কোনও মতবাদ কোনও দিন লোপ পায় নাই। নানা বিপর্যয়ের মধ্যেও চিরদিন তার অস্তিত্ব বজায় রয়েছে। কেননা সত্যের আধারেই সংসার টিকে আছে। অসত্যের ধ্বংসলীলা থেকে সত্যই জগতকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

বিশ্বের জড়চেতন, চর অচর, পশুপক্ষী, উদ্ভিদ, কীটপতঙ্গ—সমস্তই সত্যের বিভিন্ন জ্যোতিপ্রকাশ। একই বিশ্ববৃক্ষের বিভিন্ন শাখা প্রশাখা —একই আত্মা বা পরমাত্মার বিভিন্নরূপ। সাধু তুলসীদাসের কথায় জড় চেতনময় জগজীব যত সকল রামময় জানি" বা 'ঈশাবাস্যমিদম্‌সর্বং যতকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ' একের সঙ্গে অন্যে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। একে অন্য থেকে অভিন্ন। একের জীবনে অন্যের জীবন এবং একের নাশে অন্যের নাশ। চর জীবের অস্তিত্ব অচরের উপর এবং অচরের অস্তিত্ব চরের উপর। উদ্ভিদের জীবন জন্তুর উপর এবং জীবজন্তুর জীবন উদ্ভিদের উপর। এইভাবে একের সঙ্গে অন্যের অন্যোন্য সম্বন্ধ। একে অপরকে বাঁচিয়ে রাখে। একে অপরকে গতি দেয়। পরস্পরের নির্দিষ্ট

সম্বন্ধে সৃষ্টি এবং পরস্পরের নির্দিষ্ট টান বা আকর্ষণে গতি এবং স্থিতি। ইহাই সৃষ্টি স্থিতি এবং গতির স্বাভাবিক নিয়ম। এই নিয়মের ব্যতিক্রমই প্রলয় বা ধ্বংস।

এই নিয়ম জড়চেতন, চর অচর জগতে যেমন প্রযোজ্য আমাদের মনোময় বিচার জগতের বেলায়ও তেমনি। কারণ আমাদের বিচার বা মতবাদ থেকে আমরা ভিন্ন নই এবং আমরাও এই জড় চেতন জগত থেকে অভিন্ন।

আমাদের বিচার বা মতবাদ উদ্ভূত হয় আমাদের মধ্য থেকে—আমাদের বিকাশ এবং অস্তিত্ব বজায় রাখবার জন্য। সেই বিচার বা মতবাদ নিয়ে যুগ যুগ ধ'রে আমরা গৃহব্যবস্থা, সমাজব্যবস্থা বা রাজ্য ব্যবস্থাদি ক'রে আসছি। এইভাবে জগতে অসংখ্য মতবাদ, এবং সেই সমস্ত মতবাদকে অবলম্বন ক'রেই অনেক প্রকারের অর্থব্যবস্থা, রাজ্য ব্যবস্থাদি কায়েম করবার চেষ্টা হয়েছে কিন্তু সেই ব্যবস্থা বা সেই মতবাদই আজ টিকে আছে যেটা সৃষ্টির স্বাভাবিক নিয়মে সত্যকে আশ্রয় করেছে।

১। মৌলিকতত্ত্ব :—

সর্বোদয় একটি সত্যাশ্রিত মতবাদ। এই মতবাদ হিসাবে বিশ্বের সৃষ্ট পদার্থ মাত্রই এক একটি মৌলিকতত্ত্ব দিয়ে গড়া। জল, বায়ু অগ্নি ইত্যাদিতে যেমন অমুক অমুক তত্ত্ব রয়েছে এবং সেই সকল তত্ত্ব জল, বায়ু এবং অগ্নিরূপে প্রকাশিত হচ্ছে উদ্ভিদ, কীট পতঙ্গ এবং মানুষের বেলায়ও ঠিক তেমনি। অমুক অমুক তত্ত্বের প্রকাশ হয়, অমুক অমুক জীব বা বস্তুরূপে।

মানুষ মাত্রই কতকগুলি মৌলিক তত্ত্বে গড়া। শারীরিক এবং মানসিক উভয় গঠনেই মানুষে মানুষে সেই একই মৌলিক তত্ত্ব বিদ্যমান। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই স্নেহ, দয়া, ক্ষমা, প্রীতি, ভালবাসা ইত্যাদি

সদ্‌গুণ রয়েছে। বাহ্য পরিবেশের প্রতিকূলতা বশতঃ কারও মধ্যে কোনটা চাপা পড়ে গেছে এবং অনুকূলতায় কারো কোনটা ফুটে উঠেছে। প্রত্যেকেরই ভিতর আগুন থাকে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে হয়ত ছাই পড়ে যায়। ছাই সরিয়ে দিলে আগুন মূর্তরূপ নিয়ে দাঁড়ায়। হিংসা, দ্বেষ, ঈর্ষা, লোভ ইত্যাদি সমস্তই বাহ্য পরিবেশের প্রতিকূল অবস্থার ফল। বাহ্য পরিবেশ ঠিক ক'রতে পারলে মানুষের অন্তর্নিহিত সমস্ত বিকাশ সম্ভব। মানুষ মাত্রই ভগবানের সন্তান, নর মাত্রই নারায়ণ। বিভিন্ন নর নারায়ণের বিভিন্ন রূপ। দেশ, ধর্ম, জাতি, সম্প্রদায়, ধনী, দরিদ্র, ইতর ভদ্র হিসাবে ভেদ মৌলিক নয়—কৃত্রিম। মূলতঃ মানুষে মানুষে কোন ভেদ নাই।

২। 'বসুধৈবকুটুম্বকম্‌' নীতি। 'সর্বোত্র সুখিনঃ সন্তু' নীতি :—

সমস্ত সৃষ্টিই এক পরিবার। সেই হিসাবে বিশ্বের সমস্ত মানব সমাজও একটি পরিবার। দেশ, জাতি, ধর্ম, যার যাই হোক না কেন আমরা পরস্পর পারিবারিক সূত্রে আবদ্ধ। আমরা সকলেই এক। একে অন্য থেকে অভিন্ন। একের জীবন অন্যের সঙ্গে ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত। বিশ্বের সমস্ত সৃষ্ট পদার্থের বেলায় যেমন একের অস্তিত্ব অন্যের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে তেমনি বিশ্বের মানব সমাজে দেশ, জাতি, ধর্ম হিসাবে যে যাই হোক না কেন বা যে যেমন থাকুক না কেন প্রত্যেকের অস্তিত্বের উপর প্রত্যেকের অস্তিত্ব নির্ভর করে। বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীর এই বৈজ্ঞানিক যুগে এই সত্য আজ ধ্রুব সত্যরূপে পরিণত হয়েছে। একের হিতে অপরের হিত, একের উন্নতিতে অপরের উন্নতি এবং একের বিকাশে অন্যের বিকাশ। আমার শত্রুর হানি হলেও আমার হানি। কারণ সে ও আমি এক। এই হিসাবে সকলের মঙ্গলেই আমার মঙ্গল। সকলের উন্নতিতেই আমার উন্নতি, ইহাই পারিবারিক নীতি। বৃত্তি যার যাই হোক না কেন সকলের

জীবনের মূল্য সমান এবং যেহেতু বৃত্তিই জীবনের অবলম্বন কাজেই বৃত্তির মূল্যও সমান। এই ভাবে একজন উকিল, ব্যারিষ্টার বা প্রফেসারের বৃত্তি এবং একজন নাপিত বা ধোপার বৃত্তির মূল্য এক।

৩। মানুষের সদ্‌গুণের বিকাশ :—

ভগবান মানুষকে যে সমস্ত সদ্‌গুণ তত্ত্ব দিয়ে গ'ড়েছেন সেগুলির বিকাশের সীমা নাই। মানুষ যেমন ভগবানের সম্পূর্ণ কল্পনায় অক্ষম তেমনি তার অন্তর্নিহিত গুণের বিকাশে তার যে রূপ নিবে সে ধারণাও তার কল্পনাতীত। কাজেই যে যতটা পারে সদগুণের অনুশীলন ক'রলেই তার বিকাশ ততটা সম্ভব। সদগুণের অনুশীলন মানে যতটা অধিক সম্ভব সকলের মঙ্গল সাধন। সকলের মঙ্গল সাধন করতে হ'লে নিজের আত্মশক্তি জাগ্রত করতে হয়। আত্মশক্তির জাগৃতি মানে আত্মবিকাশ।

৪। আত্মবিকাশই সব ব্যবস্থার মূল :—

ধনদৌলত, ধর্ম অর্থ, সমাজ পরিবার, রাজ্যব্যবস্থা অর্থব্যবস্থা সব কিছুই মানুষের গৌরবপূর্ণ জীবনযাপনের জন্য এবং তার আত্ম-বিকাশের জন্য। ধর্মে, অর্থে, সমাজে, পরিবারে সর্বত্রই তার জীবন ব্যাপ্ত। তার জীবন মানে তার ধার্মিক জীবন, তার আর্থিক জীবন, তার সামাজিক ও পারিবারিক জীবন—সমস্তটা নিয়েই তার জীবন। জীবনের প্রত্যেক অঙ্গের সঙ্গে সমস্ত জীবনের অন্যোন্য সম্বন্ধ। জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে মানবতার পূর্ণ সম্বন্ধ। ধর্ম থেকে রাজনীতি বা অর্থনীতি বা অর্থনীতি থেকে ধর্মনীতি পৃথক নয়। মনু যেমন বলেছেন, যঃ অর্থ-শুচিঃ স শুচিঃ। এই ভাবে এক ক্ষেত্রের শুচিতা এবং অশুচিতার উপর অন্য ক্ষেত্রের শুচিতা বা অশুচিতা নির্ভর করে। এই হিসাবে সর্বোদয় অর্থব্যবস্থা ব'লে পৃথক কোন অর্থব্যবস্থা বলা যায় না। সেই

অর্থব্যবস্থার সঙ্গে সর্বোদয় ভাবধারার অন্য সব ব্যবস্থাও জড়িত। ধর্ম-বিহীন রাজনীতি বা নীতিশূন্য রাজনীতি সর্বথা পরিত্যজ্য।

৫। পুরুষকার এবং পরিবেশ ঃ—

পরিবেশের প্রভাব মানুষের উপর পড়ে। ভৌতিক পরিবেশের উপরেই মানুষের মানসিক বৌদ্ধিক বা আধ্যাত্মিক বিকাশ নির্ভর করে। কিন্তু মানুষ পরিবেশের দাস নয়। সৃষ্টির মধ্যে মানুষই একটা জীব যার শক্তি অসীম। ইচ্ছা ক'রলে সাধনার বলে সে অসীম শক্তিশালী হ'তে পারে। ইচ্ছা ক'রলে সাধনার দ্বারা সে সমস্ত বিশ্বকে হাতের মুঠার মধ্যে আনতে পারে। মাটী ভৌতিক পদার্থ। মানুষ সেই ভৌতিক পদার্থকে চ'ষে আবাদ করে। তা থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে। তাকে ঠুকে পিটে নানা প্রকার বাসনপত্র তৈরী করে এবং সেই মাটীর পুতুল পূজা ক'রেও সে দেবত্ব লাভ করে। সুগন্ধি পুষ্প বা মনোরম উদ্যান মানুষের মনে স্বর্গীয় ভাবের সৃষ্টি করে। সে দরকার হ'লে অনুর্বর উষর ভূমিতেও রমণীয় উদ্যান সৃষ্টি ক'রে তা থেকে স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করে।

এই ভাবে যুগে যুগের অভিজ্ঞতায় মানুষ বুঝতে পেরেছে কি রকম পরিবেশ তার বিকাশের অনুকূল এবং সে একথাও জানে তার শক্তি অসীম। এই জ্ঞানের বলেই সে পরিবেশকে তার বিকাশের অনুকূল ক'রে গড়ে নেয় এবং তখন পরিবেশ তার বিকাশের সহায়ক হয়। অনুকূল পরিবেশের দ্বারা মানুষ পুষ্ট ও বিকশিত হয় একথা যেমন সত্য পরিবেশকে মানুষই তার মনের মত ক'রে নেয় একথা তেমনি সত্য।

সমাজবাদ ও সর্বোদয়ে পার্থক্য—

১। সমাজবাদ বলে 'রাজ্যের সব সম্পত্তি প্রজার' আর সর্বোদয় বলে 'সব ভূমি গোপালকী'—মানে সকলের। এই হিসাবে উভয়ে সমতা দেখা যায়। সমাজবাদ ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিরোধী। জাতীয়করণ ক'রে

সমস্ত সম্পত্তি রাষ্ট্রের অধিকারে রাখতে চায়। কিন্তু সর্বোদয়সমাজ সম্পত্তির জাতীয়করণ চায় না বা ব্যক্তিগত সম্পত্তির কোন পরিমাণ বেঁধে তাকে সম্পত্তির মালিক ও ক'রতে চায় না। সে চায় ব্যক্তি সম্পত্তির রক্ষক বা অছি হোক। ব্যক্তির কাছে ভৌতিক বা আধ্যাত্মিক সম্পত্তি যার যতই থাকুক না কেন ক্ষতি নাই কিন্তু সে সমস্ত সম্পত্তি সমাজ কল্যাণেই ব্যয় ক'রবে এবং সমস্ত সমাজই এক পরিবার এই নীতিতে (সে সমাজের একব্যক্তি এই হিসাবে) তার যতটুকু গ্রহণ করা দরকার ততটুকুই গ্রহণ ক'রবে।

কোনও ব্যক্তি এই গুরুদায়িত্ব পালনে অসমর্থ হ'লে বা কর্তব্য পালনে অবহেলা ক'রলে অথবা কর্তব্যের দুরুপযোগ ক'রলে জনসাধারণ অহিংস উপায়ে তাকে সেই সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত ক'রতে পারে। ইহাই সত্যাগ্রহ।

২। সমাজবাদ কেন্দ্রীকরণ প্রথায় উৎপাদনের পক্ষপাতী কিন্তু সর্বোদয় চায় বিকেন্দ্রীকরণ।

৩। সমাজবাদের আধার ভৌতিকবাদ। ইহা ক্রমাগত ঘর-দুয়ার, বাসনকুসন, যানবাহন, ঘড়িছড়ি ধনদৌলত ইত্যাদি ভৌতিক আবশ্যকতার বৃদ্ধি ক'রে জীবনমান (standard of living) উচ্চ করার পক্ষপাতী। কিন্তু সর্বোদয়ের আধার আধ্যাত্মিকবাদ। ভৌতিক আবশ্যকতা যতদূর সম্ভব কম করাই তার আদর্শ। তার ভৌতিক আবশ্যকতা ততটুকু যতটুকু দেহধারণের পক্ষে অপরিহার্য আর দেহের আবশ্যকতা আধ্যাত্মিক বিকাশের জন্য। সরল অনাড়ম্বর এবং কর্তব্যনিষ্ঠ জীবনই মানুষের আদর্শ জীবন।

৪। সমাজবাদে রাজ্য বা সরকার সদা অপরিহার্য। সরকারের নিয়ন্ত্রণ ব্যতিরেকে সমাজবাদের কোনও কার্যক্রম কাজে পরিণত করা অসম্ভব। সেইজন্য সমাজবাদ চায় সরকারের ক্রমসুদৃঢ়ীকরণ

(consolidation) কিন্তু সর্বোদয় চায় সরকারের ক্রমবিলীনীকরণ। সর্বোদয় নীতিতে সরকার সংগঠিত হিংসার দ্যোতক। তার আদর্শ হ'চ্ছে শাসনহীন বা রাজ্যহীন সমাজগঠন। স্বাবলম্বনের ভিত্তিতেই সেই আদর্শের স্থাপনা সম্ভব।

৫। সমাজবাদ মনে করে সমাজের জন্যই ব্যক্তি। কাজেই এতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য থাকে না বা ব্যক্তিত্ব বিকাশের আবশ্যক অবকাশও সম্ভব নয় এবং সমাজবাদী রাজ্যে বাস্তবিক গণতন্ত্র স্থাপনও অসম্ভব। কিন্তু সর্বোদয় সমাজে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য সর্বথা অক্ষুণ্ণ থাকে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে ব্যক্তিত্ব বিকাশের আবশ্যক সুযোগ থাকে। কাজেই সর্বোদয় সমাজেই প্রকৃত গণতন্ত্র স্থাপন সম্ভব।

৬। সমাজবাদ রাজসত্তা হাতে এনে সমাজবাদের আদর্শ স্থাপন ক'রতে চায় কিন্তু সর্বোদয় বলে 'আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিখায়'। সর্বোদয়ের আদর্শে আস্থাবান ব্যক্তিগণ নিজ নিজ ব্যক্তিগত জীবনে প্রথমে সেই আদর্শের আচরণ আরম্ভ ক'রবেন। ক্রমে সেই আচরণের প্রভাবে পরিবেশ সৃষ্টি হবে। সমাজবাদ আইনের বলে বিশ্বাসী। কিন্তু অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সর্বোদয় আইন প্রয়োগকে হিংসাত্মক কাজ মনে করে।

সাম্যবাদ ও সর্বোদয়ে সমতা ও পার্থক্য ঃ—

মার্ক্স, লেনিন ও গান্ধী সকলেই চেয়েছেন জগতের দুঃখ দারিদ্র্য দূর হোক। পৃথিবীর মানুষ মাত্রই প্রকৃতির দান। মানবজাতির অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান বিজ্ঞান সম্ভারের ন্যায্য অংশ প্রত্যেকে গ্রহণ করুক।

উভয়ের উদ্দেশ্য এবং আদর্শ অতীব মহান। কিন্তু সেই উদ্দেশ্য সাধনে উভয়ের দর্শন ও পন্থা একেবারে ভিন্ন। পৃথিবীতে এখন এই দুইটিই প্রধান মতবাদ। পার্থিব এবং অপার্থিব উভয়বিধ সমস্যা সমাধানে এই দুইয়ের একটিকে বেছে নিতে হবে। বিনোবাজী বলেন এখন সমাজ-

বাদ ক্রমশঃ গান্ধীবাদ বা সর্বোদয়ের দিকে এগিয়ে আসছে আর সাম্যবাদ বা কম্যুনিজম দূরে স'রে যাচ্ছে। উভয়ের বাহ্যতঃ খানিকটা মিল দেখা গেলেও মূলতঃ দুটি একেবারে পৃথক। কাজেই বাছতে হ'লে এই দুইয়ের মধ্যে একটিকে বাছতে হয়।

সর্বোদয়ের উদ্দেশ্য সাধনে সত্য এবং অহিংসা অপরিহার্য কিন্তু সাম্যবাদে সাধনের শুদ্ধতার কোনও বালাই নাই। বরং সাম্যবাদের উদ্দেশ্য সাধনে অনেকক্ষেত্রে হিংসা অপরিহার্য কিন্তু এই হিংসা বর্জ্জিত সাম্যবাদ মানে গান্ধীবাদ বা সর্বোদয় তা নয়।

১। **সৃষ্টিতত্ত্বঃ—**

সর্বোদয় এবং সাম্যবাদে মৌলিক পার্থক্য হলো জীবন এবং সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির তারতম্যে। অন্য সব বিভেদের জন্ম এথেকেই। মার্ক্সের মতে বা সাম্যবাদের মতে সৃষ্টির মূলতত্ত্ব হ'লো জড়ভূত—চিৎশক্তি বা আত্মা নয়। সমস্ত প্রাণীর জন্ম এই জড় প্রকৃতি থেকেই। একটি জড় ঘড়ি বা রেডিও এবং একটি জীবন্ত মানুষে মূলতঃ কোনও ভেদ নাই। যেমন রেডিও বা ঘড়ি বিকল হ'য়ে গেলে অচল তেমনি মানুষের শরীর থেকে অনুভূতি চ'লে গেলে সেও অচল বা মৃত।

মানুষ আসলে পশুরই বংশধর। হাজার হাজার বছরের ক্রমবিকাশের পর মানুষ বর্তমান স্তরে এসেছে। তার চেতনার ক্রমবিকাশ হ'য়েছে। তা না হয় অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গে তার বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। মানুষ ভৌতিক পদার্থের সমপর্য্যায়ভুক্ত।

গান্ধীজী বা সর্বোদয় মানুষ কেন—মানবেতর কোন সামান্য প্রাণীকেও এই ভাবে জড় বস্তুর সমপর্যায়ভুক্ত করে না। সর্বোদয় মতে বিশ্বের এই মৌলিক সত্তা জড় নয়—চেতন আত্মা। যাকে আমরা অচেতন বা জড় বলি তার অস্তিত্বও পরমাত্মার সত্তারই অংশ।

'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগত'—ঈশ্বর সর্বব্যাপী। পরমাত্মার বাইরে তার কোনও অস্তিত্ব নাই। আত্মা ছাড়া তার অস্তিত্বের কোনও সাক্ষী নাই। পরমাত্মা থেকেই সব কিছুর উদ্ভব। তাতেই তার স্থিতি এবং তাতেই তার লয়। আত্মাই মূলবস্তু, আত্মার সঙ্গে শরীরের সম্বন্ধ—শরীরের সঙ্গে কাপড়ের সম্বন্ধের মত। আমাদের প্রত্যেক ভাল কাজের দ্বারাই আত্মবিকাশের অবকাশ আছে।

আত্মাই স্থায়ী মূলতত্ত্ব। অন্যান্য রূপ ও শক্তি তারই জ্যোতি-প্রকাশ। অসংখ্য চেতন ও জড় পদার্থ, দৃশ্য ও অদৃশ্য নানা শক্তি, সদসৎ নৈতিক আধ্যাত্মিক গুণাগুণ, অতি ক্ষুদ্র এবং অতি বৃহৎ নানা আয়তনের বস্তু নিয়েই এই বিশ্ব সংসার এক অবিনশ্বর চেতনা। উহারই নাম সত্য—আত্মা ও পরমাত্মা। বিভিন্ন রূপ শুধু বাহ্য প্রকাশ মাত্র। সব কিছুই সবপ্রাণীই সেই একই চেতনার অংশমাত্র।

২। সাধন গ্রহণে হিংসা ও অহিংসা—

যেহেতু মার্ক্স বা সাম্যবাদমতে মানুষ আসলে পশুরই বংশধর এবং অন্যান্য ভূতের সমপর্য্যায়ভুক্ত কাজেই তার ভৌতিক আবশ্যকতা বাড়ায় কোনও দোষ নাই বা তার কাজে (সমাজের কাজে) জড় ও চেতন বস্তুর ব্যবহারেও কোনও পার্থক্য নাই। উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপরই জীবন্ত বা মৃত বস্তুর অস্তিত্ব বা বিকাশ নির্ভর করে। ন্যায় অন্যায় হিংসা অহিংসা পাপপুণ্য এগুলি মানুষের গড়া বিধিনিষেধ মাত্র। উদ্দেশ্য সিদ্ধির কাজে এগুলির কোনও মূল্য নাই। যে কোনও উপায়ে সম্ভব ভৌতিক আবশ্যকতা পরিপূরণে কোনও দোষ অধর্ম বা পাপ হয় না।

কিন্তু গান্ধীজী বা সর্বোদয়ের মতে যেহেতু সকল প্রাণীই সেই একই চেতনার অংশ, সকল প্রাণীই যখন এক এবং সমগ্র বিশ্ব তথা আমি নিজেও যখন সেই একই চেতনা বা ঈশ্বরের অভিব্যক্তি অতএব কাকে আমি শত্রু ব'লে মনে করবো? নিজের মধ্যে মন্দ আছে জেনেও

যখন আমি আত্মহত্যা করি না বা করা উচিত মনে করি না তেমনি অপরের মধ্যে মন্দ আছে ব'লে বা সে আমার মতে আসছে না ব'লে সে হিংসার যোগ্য একথা কি করেই বা মনে করতে পারি ?

৩। হৃদয় পরিবর্তন—

মার্ক্স বা সাম্যবাদীদের মতে সমাজে শোষক এবং শোষিত পরস্পর বিরোধী দুটী শ্রেণী থাকে। এই দুই শ্রেণীর সংঘর্ষ অপরিহার্য। এই সংঘর্ষে শোষক বা পুঁজিপতি শ্রেণীকে নিশ্চিহ্ন ক'রে শোষিত শ্রেণী বা সর্বহারাদের অধিকার স্থাপন আবশ্যক। এই অধিকার স্থাপনে হিংসাত্মক উপায় অবলম্বন সাম্যবাদনীতি বিরুদ্ধ নয়।

কিন্তু গান্ধীজী বা সর্বোদয়বাদীরা বলেন সমাজে শোষক বা শোষিত হিসাবে কোনও শ্রেণী থাকে না। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সৎপ্রবৃত্তি রয়েছে। সেই প্রবৃত্তি কারো বেশী বিকশিত কারো কম। বিকাশ কম হলেই শোষণস্পৃহা বলবতী হয়। কিন্তু বিকাশের সুযোগ পেলে বা বিকাশের চেষ্টা করলে মানুষ মাত্রেরই এই বৃত্তি পূর্ণতা লাভে সমর্থ হয়, এটী যতই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় শোষণস্পৃহা ততই কম হয় !

পুজিপতি ও গরীব উভয় শ্রেণীর মধ্যেই সদসৎ লোক রয়েছে। পুঁজিপতিদের মধ্যেও মহান লোক আছে আর সর্বহারাদের মধ্যেও নীচলোক আছে। পুঁজিপতি হ'লেই অসৎ এবং সর্বহারা হ'লেই সৎ হ'বে তার কোনও মানে নাই। পুঁজিবাদ হচ্ছে অপরকে খাটিয়ে বা অপরকে শোষণ ক'রে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করার একটা মনোবৃত্তি। এই মনোবৃত্তি বেশী-পুঁজিওয়ালাদের কাছে বেশী এবং কম-পুঁজিওয়ালাদের কাছে কম আর পুঁজিহীনের কাছে নাই এ ধারনা সম্পূর্ণ ভুল। অনেক পুঁজিহীনের এই মনোবৃত্তি হয়ত এত বেশী যে সে সুযোগ পেলে বা সুযোগ খুঁজেও ক্ষণমুহূর্ত্তে একজন অতি বড় পুঁজিপতি হ'তে চায়। আবার অনেক বড় পুঁজিপতির এই বৃত্তি এত কম যে তার অতুল

ঐশ্বর্য্যের মধ্যেও সে কপর্দ্দকহীন সাধুর মত স্বচ্ছন্দে জীবন কাটায়। যেমন রাজর্ষি জনক। বিষয় বাসনা তাকে স্পর্শ করে না। বিকাশের সুযোগ পেলে অসৎ সর্বহারাও যেমন সৎ হ'তে পারে—অন্যায়ী সর্বহারাও যেমন ন্যায়ের উন্নত স্তরে উন্নীত হ'তে পারে তেমনি অসৎ পুঁজিপতিও সৎ এবং ন্যায়পরায়ণ হ'তে পারে। অতএব সমাজকে শোষক এবং শোষিত এই দুইভাগে বিভক্ত করা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক। সমাজে যদি কোনও শ্রেণী আছে বা থাকে ত সৎভাবপ্রধান আর অসৎভাবপ্রধান—এই দুই শ্রেণী। শোষক এবং শোষিত এই দুই অস্বাভাবিক ভাগে বিভক্ত ক'রে সমগ্র সমাজ উন্নয়নের চেষ্টা যেমন ভ্রমাত্মক তেমনি অসম্ভব। অহিংসা, প্রেম এবং সত্যের পথে হৃদয় পরিবর্ত্তনের দ্বারা সমগ্র সমাজের সৎপ্রবৃত্তি এবং শুভবুদ্ধি জাগ্রত ক'রেই সমগ্র সমাজ উন্নয়ন বা সমগ্র সমাজের কল্যাণ সাধন সম্ভব।

৪। বিবর্তন বাদ :—

(ক) বিবর্ত্তনের পথে দেখা যায় যেন মানুষের অগ্রগতি এবং পশ্চাৎগতি উভয়ই ঘটেছে। মানুষ তার শক্তিমত চিন্তা করেছে। কিন্তু হয়ত সেই চিন্তা সব সময় নির্ভুল থাকেনি। এই দীর্ঘ জীবনে মানুষ অনেক ক্ষেত্রে যেমন ভুল করেছে তেমনি ভুল সংশোধনও করেছে। ভুল সংশোধনের এই ক্রম চলে আসছে।

রাজনীতিক্ষেত্রে দেখা যায় একছত্র রাজ্যশাসন (Monarchy), বৈধানিক রাজতন্ত্র (Constitutional Monarchy), অভিজাত শ্রেণীর দ্বারা শাসন (Oligarchy) গণতন্ত্র (Democracy), সংযুক্ত রাষ্ট্র (Fedaral govt.), এবং পার্লামেন্টারী শাসন আদি নানাপ্রকার শাসনব্যবস্থা পুনঃ পুনঃ পরীক্ষিত হয়েছে কিন্তু এখনো প্রকৃত সুখশান্তির নাগাল পাওয়া যায়নি। জগত এই ভাবেই চলেছে। না জানি কোথায় ?

মানুষের অর্থনীতিক মর্যাদা ও মুক্তির উপর জগতের রাজনীতিক সংস্থাগুলির কিরূপ প্রভাব বিস্তার ক'রছে তা বিচার ক'রে মার্ক্স এই সিদ্ধান্তে পৌছান যে পৃথিবীতে রাজনীতিক ক্ষমতা ক্রমে শ্রমিকদের হাতে চলে আসতে বাধ্য। রাষ্ট্রে ক্রমে তারাই বেশী সুবিধার অধিকারী হ'য়ে উঠবে। তিনি বলেন মানুষকে বিবর্তনের কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট স্তর অতিক্রম ক'রে চলতে হয়। সেগুলি এমন যে ওদের ডিঙ্গিয়ে যাওয়ার কোনও উপায় নাই। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষ সহযোগিতা করুক অথবা বিরোধিতা তাতে এই নিয়তির ব্যতিক্রম নাই। 'যদ্ ভাবিনে তদ্ ভাবি, ভাবি চিন তদন্যথা'—যা ঘ'টবার নয় তা ঘটবে না, যা ঘটবার তা ঘ'টবে। নিয়তির গতি পরিবর্তনের চেষ্টা নিরর্থক। এতে যে বাধা দিবে তাকে স'রে যেতে হবে।

মার্ক্সীয় দর্শনে ইহাই ডিটারমিনজিম্। এটী নিছক অদৃষ্টবাদ। তাঁর তত্ত্বানুসারে বিপ্লব বা রাজ্যশাসন বল প্রয়োগ ছাড়া সম্ভব নয়। বিপ্লব সংঘটন এবং রাজদণ্ড পরিচালন ব্যতীত সাম্যবাদ স্থাপন অসম্ভব।

কিন্তু প্রশ্ন আসে যা হবার যদি তাই হবে তাহলে যে বাধা দিবে তাকে সরিয়ে ফেলার কথাই বা উঠে কেন? নিয়তির গতি অপরিবর্তনেয় স্বীকার করা মানে পুরুষকার অস্বীকার করা। পুরুষকার অস্বীকার করা এবং সঙ্গে সঙ্গে নিয়তির গতিতে বাধা দানকারীকে সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করা দুটী পরস্পর বিরোধী উক্তি নয় কি?

বলপ্রয়োগ ছাড়া যদি রাজ্যশাসন সম্ভব না হয় তাহলে যে সময় যে শক্তিশালী হবে রাজক্ষমতাও তারই হাতে থাকবে। কাজেই রাজক্ষমতা হাতে লওয়া এবং রাজক্ষমতা বজায় রাখার চিরন্তন প্রতিযোগিতা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলতে থাকবে। সব সময় রাজগদি দখল এবং রাজগদি রক্ষার সংঘর্ষ চলবে। সেই রকম পরিবেশে রাজ্যে ন্যায়, নীতি ইত্যাদি মানবোচিত সদ্গুণ রক্ষা করা বা বিকাশ করা সম্ভব হবে কি?

প্রাকৃতিক নিয়ম হিসাবে যে যেমন তা থেকে সেই রকম জিনিষের উদ্ভব হয়। মানুষ থেকে মানুষ পশু থেকে পশু এবং উদ্ভিদ থেকে উদ্ভিদ হয়। গরু থেকে গরু এবং ছাগল থেকে ছাগলই হয় বা আম থেকে আম এবং নিম থেকে নিমই হয়। ভৌতিক পদার্থের বেলায় যেমন মানবীয় সদ্গুণ দুর্গুণের বেলায়ও তেমনি। প্রেম থেকে প্রেম এবং হিংসা থেকে হিংসারই সৃষ্টি হয়। বলপ্রয়োগ বা হিংসা ছাড়া যদি রাজ্যশাসন এবং বিপ্লব সম্ভব না হয় তাহলে প্রকৃতির এই স্বাভাবিক নিয়মে হিংসা থেকে প্রতিহিংসার সৃষ্টি হবেই। অতএব এই নীতির আধারে সমাজব্যবস্থা হ'লে হিংসা এবং প্রতিহিংসার অনলে সমাজ চিরদিন দগ্ধ হ'তে থাকিবে না কি ?

(খ) মার্ক্সের মতে মানব সমাজের পরবর্ত্তী ক্ষেপ হলো ধনতন্ত্রের বিলোপ এবং সর্বহারাদের ক্ষমতা লাভ। প্রকৃতি সর্বহারাদের দ্বারাই ধনতন্ত্রের বিলোপ সাধন করবে। এতে সব বাধা ব্যর্থ হবে। সর্বহারাদের কর্তৃত্ব ও শাসন সুপ্রতিষ্টিত না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ এবং বল প্রয়োগ থেকে মুক্ত শান্ত ও সাম্যময় শ্রেণীবিহীন সমাজ গঠিত হ'তে পারে না।

ধনতন্ত্র ত আর কিছু নয় একটা শোষক মনোবৃত্তির দ্যোতক—সে মনোবৃত্তি ব্যক্তি শ্রেণী বা রাষ্ট্রের হোক অথবা সর্বহারাদের হোক'। সেই মনোবৃত্তির দরুনই লোকে শ্রেণী বা রাষ্ট্রকর্তৃত্ব বা (শাসনশক্তি) নিজের হাতে রাখবার চেষ্টা করে। মার্ক্স চাচ্ছেন সর্বহারাদের হাতে কর্তৃত্ব থাকুক। তার মানে যাদের কারণে তারা সর্বহারা হ'য়ে গেছিল বা যাদের কারণে তাদের সর্বহারা হ'য়ে যাওয়ার অথবা কর্তৃত্বচ্যুত হ'য়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে তাদের উপর সদাই কর্তৃত্ব ও শাসন চালাবার চেষ্টা করবে এবং সেটা আরও দৃঢ় ও সংঘবদ্ধভাবে। কাজেই এই পথে সমাজ থেকে ধনতান্ত্রিক মনোবৃত্তির বিলোপ সাধন সম্ভব কি ?

(গ) মার্ক্স মনে করেন শ্রেণী সংঘর্ষের মধ্য দিয়েই সর্বহারাদের

একাধিপত্য সম্ভব। জমি, খনি ও সম্পদের অন্যান্য আধারের উপর পুঁজিপতিদের মালিকানার উচ্ছেদ সাধন এবং কারখানাসমূহের রাষ্ট্রভুক্তি হ'লেই শ্রেণী সংঘর্ষের অবসান হবে। এইভাবে পৃথিবীতে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হ'লে কোনও শ্রেণী থাকবে না বা শ্রেণীবিভেদ অথবা শ্রেণীবিরোধ থাকবে না। উৎপাদনের যন্ত্রগুলির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা থাকবে না। মুনাফা গ্রহণের কোনও প্রকার সুযোগ থাকবে না। তখন আপনা হ'তেই ধীরে ধীরে রাষ্ট্র বা ষ্টেটের অস্তিত্ব লোপ পাবে।

এইভাবে জমি, খনি, কলকারখানা ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদ এবং উৎপাদনের সাধন থেকে পুঁজিপতিদের মালিকানার উচ্ছেদ হবে এবং রাষ্ট্রের অস্তিত্ব লোপের পূর্ব পর্যন্ত (Dictatorship of the Proletariat) 'সর্বহারাদের একাধিপত্য'রূপ রাষ্ট্রের হাতে কর্তৃত্ব বা মালিকানা থাকবে। কাজেই ততদিন পর্যন্ত এইরূপ রাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় উৎপাদন ও রাজনীতিক ব্যবস্থা সঞ্চালনের জন্য একটি ব্যবস্থাপকশ্রেণী এবং উৎপাদন ইত্যাদি কাজের জন্য একটি শ্রমিকশ্রেণী থাকবেই। দুটি শ্রেণী থাকলেই যদি শ্রেণী সংঘর্ষ হয় (হয় একথা সত্য) তাহলে এই ব্যবস্থায় শ্রেণী সংঘর্ষের অবসানই বা কি করে সম্ভব ? আর শ্রেণী সংঘর্ষেরই যদি অবসান না হয় তাহলে মার্ক্সের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সরকারবিহীন এবং শ্রেণীবিহীন সমাজ গঠনই বা কি করে সম্ভব ? যেদিন শ্রমিকশ্রেণীর হাতে ক্ষমতা আসবে সেদিন তারা ব্যবস্থাপক হ'য়ে দাঁড়াবে। সে অবস্থায়ও কি সরকারবিহীন সমাজের কল্পনা করা যায় ?

(সাম্যবাদের বর্ণনায় শাসনবিহীন সমাজ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে)

৫। ব্যক্তি ও সমাজ :—

ব্যক্তির জীবনের চেয়ে সমাজজীবন দীর্ঘতর। তাই মার্ক্সীয়েরা মনে করেন ব্যক্তির চেয়ে সমাজের মূল্যই বেশী। শতপদ সরীসৃপের শরীর

রক্ষার জন্য দরকার হ'লে যেমন কয়েকটি পা-ও বাদ দেওয়া যায় সমাজ রক্ষার জন্যও আবশ্যক ক্ষেত্রে কিছু লোক হত্যা করা যেতে পারে। রাষ্ট্রের হিতের জন্য দরকার হ'লে কিছু লোকের হত্যা করা অন্যায় নয়। এমন কাজে হিংসা অহিংসার কোনও প্রশ্ন নাই। রাষ্ট্র বা সমাজের জন্যই ব্যক্তি, কাজেই রাষ্ট্রীয় আবশ্যকতায় দরকার হ'লে ব্যক্তিগত মত, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য এবং ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য বলি দেওয়া যেতে পারে।

কোনও রাষ্ট্রে এই নীতি স্বীকার করা মানে সেই রাষ্ট্রের ফাঁসি-কাঠ ও জল্লাদের চিরব্যবস্থা রাখা। কেননা কখন কে রাষ্ট্রের অহিত করে বসবে কে জানে? আর এক কথা। রাষ্ট্রের অহিতের নির্ণায়ক কে হবে? স্বভাবতঃই সেই হবে যার হাতে রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা থাকবে। শেষকালে আসলে এই জিনিষই দাঁড়াবে রাষ্ট্রের সত্তাধারীর বিরুদ্ধে যে কথা বলবে বা যে তার শাসন ব্যবস্থার বিরোধিতা ক'রবে তাকে ফাঁসিকাঠে ঝুলতে হবে। রুশদেশের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রলে এর উদাহরণ পাওয়া যাবে। ট্রট্স্কী, বেরিয়া প্রভৃতির জলন্ত উদাহরণ আমাদের চোখের সামনে রয়েছে। (ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের লোপ সম্বন্ধে সাম্যবাদের বর্ণনায় আলোচনা করা হয়েছে)।

কিন্তু সর্বোদয় ব্যক্তি ও সমাজ উভয়েরই সমউন্নতি এবং সম-বিকাশ চায়। 'ওঁ সহনাববতু সহনৌভুনক্তু সহবীর্য্যং করবাবহৈ তেজস্বীনাবধীতমস্তু'—নীতিতে গুরু শিষ্য, ভাইবোন, স্বামীস্ত্রী ব্যক্তি ও সমাজ সকলের উন্নতি এবং বিকাশসাধনই তার লক্ষ্য।

৬। পরিবেশের প্রভাব :—

মার্ক্স বলেন, মানুষের মন গঠনে ভৌতিক পরিবেশই মূল জিনিষ। তার উর্ধ্বে যাওয়ার মানুষের কোনও ক্ষমতা নাই। গান্ধীজী বা

সর্বোদয় মতে পরিবেশের প্রভাব মানুষের মনের উপর যথেষ্ট ক্রিয়া করে বটে কিন্তু আবশ্যকতাবোধে মানুষই তাতে পরিবর্তন আনে। মানুষই তার পরিবেশকে তার উন্নতির অনুকূল ক'রে গড়ে তোলে।

পন্থা যাই হোক না কেন সাম্যবাদী রুশে তাদেরই সিদ্ধান্তের প্রতিকূলে প্রতিকূল পরিবেশকে অনুকূল করবার চেষ্টা চ'লে আসছে। সেখানে শুধু প্রকৃতির উপর ছেড়ে না দিয়ে পুরুষকারও করা হয়েছে। রাশিয়ায় লেনিনরূপী একজন মানুষ পুরুষকারের দ্বারাই নিজের মনের মত পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন এবং সেই পরিবেশকে বজায় রাখবার জন্য তাঁর পরবর্তী অনুগামীরাও নিজেদের সঙ্গী সাথীদের হত্যা ক'রতে আদৌ দ্বিধা বোধ করেনি। এখনও সেই ধারা চলেছে। প্রকৃতির হাতে ছেড়ে দিয়ে মার্ক্সীয়রা কেউ বসে আছে কি?

৭। ভৌতিক আবশ্যকতা :—

মার্ক্সের মতে ভৌতিক সুখই মানুষের কাম্য। ভৌতিক সুখ সাধনের প্রাচুর্য যত বেশী হবে মানুষ তত বেশী সুখী হবে। কিন্তু সর্বোদয় মতে মানুষের ভৌতিক সম্পদ বা ভৌতিক সুখ ততটুকু দরকার যতটুকু তার আধ্যাত্মিক বিকাশের সহায়ক।

এর দ্বারাই বুঝা যায় সর্বোদয় এবং সাম্যবাদ মূলতঃ দুটি পৃথক জিনিষ। দুটির দর্শনই সম্পূর্ণ পৃথক। একটির আধার জড়বাদ আর একটির আধার আধ্যাত্মিকতাবাদ। দুটি "বাদের" সূক্ষ্মতত্ত্বে না গিয়েও যে কোনও বাস্তববাদী এটা স্বীকার করবে যে ভৌতিক সুখ সাধনের প্রাচুর্য বাড়িয়ে কোনও মানুষ সুখী হতে পারে না। ঘি তে আগুন দেওয়ার মত ভোগানল বাড়তেই থাকে।

দ্বিতীয়তঃ ভৌতিক সুখ সমৃদ্ধি যতই বেশী হয় সেইগুলির উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণের জন্য ততই শক্তিশালী সরকারের আবশ্যকতা

অনিবার্য হ'য়ে পড়ে। অতএব এই পথে গিয়ে সরকারবিহীন সমাজ গঠন কি সম্ভব ?

৮। সাম্যবাদ ও সাম্যযোগ,—

গান্ধীজী ও সর্বোদয়বাদীরা মনে করে মানবতার দৃষ্টিতে সাধারণতঃ মানুষ অপূর্ণ। কিন্তু তাদের বিশ্বাস সাধনার দ্বারা মানুষ অনেক পরিমাণে পূর্ণতা লাভ ক'রতে পারে। বুদ্ধদেব বলেন, প্রত্যেক মানুষ চেষ্টা ক'রলে বুদ্ধ হতে পারে। কাজেই কোনও মানুষ তাদের কাছে নীচ, ঘৃণ্য বা পূর্ণতা লাভের অযোগ্য নয়। মানুষে মানুষে কোনও ভেদ নাই। যথার্থ চেষ্টা এবং শিক্ষার দ্বারা যে কোনও মানুষকে সাধারণ স্তর থেকে অনেকটা উন্নত স্তরে আনা যায়। কিন্তু অপরকে উন্নত স্তরে আনার আগে নিজেকে উন্নত হ'তে হয়। নিজে যতটা উন্নত হওয়া যায় অপরকেও সেই অনুপাতে উন্নত করা যায়। অতএব সর্বোদয়-আদর্শ সমাজে প্রয়োগ করার আগে নিজের উপরই আগে প্রয়োগ করাই বাঞ্ছনীয়। কারও অপেক্ষায় বসে থাকা উচিত নয়।

সর্বোদয় নীতিতে সমস্ত সৃষ্টিই এক পরিবার। মানবাত্মা এবং মানবেতর আত্মার মূলতঃ কোনও ভেদ নাই। ভেদ, এইটুকু যে মানব-আত্মার বিকাশ যতটা সম্ভব মানবেতর প্রাণীর ততটা নয়।

'আত্মৌপম্যেন সর্বত্র' ইহাই সর্বোদয়ের মূলনীতি। এই নীতি অনুযায়ী গান্ধীজী বা সর্বোদয়বাদীগণ সর্বোদয়ের আদর্শ স্ব স্ব জীবনে দুই ভাবে প্রয়োগ করেন। প্রথমতঃ ভৌতিক আবশ্যকতায় ভৌতিক স্থিতি হিসাবে দেশের সকলের দিকে লক্ষ্য ক'রে প্রত্যেকের পক্ষে যতটুকু গ্রহণ করা সম্ভব তাঁরা ততটুকু গ্রহণ করেন। দেশ গরীব হ'লে আর্থিক সমানতা আনয়নের জন্য তাঁরা দারিদ্র্য ব্রত গ্রহণ করেন এবং ভৌতিক আবশ্যকতা পরিপূরণের জন্য পরিবারের এক ব্যক্তি

হিসাবে যাঁর যতটা কাজ করা দরকার দৈনন্দিন জীবনে ততটা করবার চেষ্টা করেন।

দ্বিতীয়তঃ সমাজকে প্রেমময় সুখময় এবং প্রীতি ও সৌহার্দপূর্ণ ক'রতে হ'লে সমাজের সকলের সদ্‌গুণ এবং সৎপ্রবৃত্তির বিকাশ করা দরকার। এইজন্য তাঁরা স্ব স্ব জীবনে মানবোচিত সদ্‌গুণের বিকাশের সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। অহিংসা সত্য ইত্যাদি যার ভিত্তিতে সর্বোদয়সমাজ গ'ড়তে চান স্ব স্ব জীবনে সেই সকল আদর্শ রূপায়িত করবার চেষ্টা করেন। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, অসংগ্রহ, শরীরশ্রম, অস্বাদ, সর্বত্রভয়বর্জন, সর্বধর্মেসমভাব, স্বদেশী, অস্পৃশ্যতাবর্জন এই এগারটি জিনিষ গান্ধীজী নিজে মহাব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন এবং সর্বোদয়বাদীরাও এইগুলি ব্রতহিসাবে পালনের চেষ্টা করেন।

আদর্শকে নিজ জীবনে রূপায়িত করার সাধনাকেই যোগ বলা হয়। গান্ধীজী এবং সর্বোদয়বাদীরা সমাজে সাম্যের আদর্শ স্থাপন করতে চান তাই তাঁরা 'সাম্যযোগের' সাধনার পক্ষপাতী। গান্ধীজী নিজে কর্ম জীবনের প্রায় প্রথম থেকেই এই সাধনায় লেগেছিলেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই সাধনাই ক'রে গেছেন। তাঁর নীতি অনুযায়ী সর্বোদয়বাদীরা সাম্যযোগী হবে—সাম্যবাদী নয়।

সাম্যবাদীরা সাম্যের "বাদ" করেন বা সাম্যের বাণী প্রচার করেন, সাম্যের তত্ত্ব নিজ জীবনে রূপায়িত করার সঙ্গে তাঁদের কোনও সম্বন্ধ নাই। সরকারের হাতে সাম্যবাদ স্থাপনের ক্ষমতা না আসা পর্যন্ত তাঁরা প্রচার করতে থাকেন। সেইজন্য গান্ধীজী এক সময় বলেছিলেন "সাম্যবাদীরা আর্থিক সমানতা স্থাপনের জন্য মাত্র প্রচার ছাড়া আর কিছুই ক'রতে পারেন না। প্রচারের দ্বারা তাঁরা লোকের মনে হিংসা, দ্বেষ, সৃষ্টি করার পক্ষপাতী। এইভাবে রাজসত্তা হাতে পাওয়ার

পরই তাঁরা সমানতা স্থাপনের আশা পোষণ করেন।......আমি ঘৃণার দ্বারা নয় প্রেমের দ্বারাই লোককে আমার কথা বুঝাব এবং অহিংসার দ্বারা আর্থিক সমানতা আনবার চেষ্টা করবো। আমি সমস্ত সমাজকে নিজের মতে আনবার জন্য বসে থাকার পক্ষপাতী নই—বুঝা মাত্রই নিজ জীবনে প্রয়োগ করার পক্ষপাতী।"

ভৌতিকবাদের উপর অবলম্বিত হওয়ার ফলে সাম্যবাদে ব্যক্তির আত্মার বিকাশের কোনও প্রশ্নই নাই। ব্রহ্মচর্য অবলম্বন বা অন্য ইন্দ্রিয়গুলির সংযমের কোনও বালাই নাই। সাম্যবাদে ধর্মের কোনও স্থান নাই। তাদের মতে ধর্ম গরীব বা মূর্খ লোককে আয়ত্তে রাখবার একটা কৌশল। সমাজজীবনে স্বদেশী, অস্বাদ ইত্যাদি ব্রতের কোনও মূল্য নাই। এগুলি বোকামি বা নিছক ভাবুকতা ছাড়া আর কিছুই নয়। স্বাবলম্বন এবং বিকেন্দ্রীকরণের দ্বারা সমাজের প্রকৃত কল্যাণ সাধন অসম্ভব।

৯। বিতরণ ব্যবস্থায় পরিবার নীতি—

আর্থিক ক্ষেত্রে বিতরণ ব্যবস্থায় সর্বোদয়বাদীরা পারিবারিক নীতির সমর্থক। পরিবারে স্ত্রী পুরুষ, বালকবৃদ্ধ, অক্ষম সক্ষম, বুদ্ধিমান বোকা, অন্ধ খঞ্জ ইত্যাদি যে যেমন ধরণের লোক থাকুক না কেন যেমন যে যার শক্তি মত কাজ করে এবং পরিবারের সামর্থ্য অনুযায়ী প্রত্যেকে ভরণ-পোষণ যোগ্য অংশ গ্রহণ করে তেমনি মানুষ তার শক্তিমত সমাজের সেবা করবে এবং সমাজের সামর্থ্য অনুযায়ী প্রত্যেকে প্রত্যেকের ভরণ-পোষণযোগ্য অংশে পুষ্ট হবে।

প্রত্যেক মানুষের শারীরিক বা মানসিক গঠন সমান নয়, কাজেই সেবার তারতম্য থাকা স্বাভাবিক। মায়ের সঙ্গে ছেলের, ভায়ের সঙ্গে বোনের, স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর এইভাবে অন্ধ খঞ্জ, বুদ্ধিমান, বোকা হিসাবে সেবার পার্থক্য থাকবেই। কিন্তু এই পার্থক্য সমাজের কারো পক্ষে

ক্ষতিকারক হয় না। এগুলি পরস্পরের পরিপূরক। সেবায় পার্থক্য যাই থাকুক না কেন সর্বোদয় যেহেতু মানুষ মাত্রেরই আত্মার সমানতায় বিশ্বাস করে সেইজন্য সেই নীতি অনুযায়ী সমাজে ব্যক্তিভেদ এবং শক্তিভেদ হিসাবে সেবাভেদ হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যেকের সেবার আর্থিক মূল্য সমান। সেবাশক্তির তারতম্য হিসাবে পোষণ বস্তুর তারতম্য রাখা অন্যায়। কেননা পোষণ ভৌতিক বস্তু এবং সেবা নৈতিক বস্তু। নৈতিক বস্তুর মূল্য ভৌতিক বস্তুর মূল্যে আঁকা মূলতঃ ভুল।

ব্যক্তিগত দৃষ্টিতে মানুষের বিকাশে বুদ্ধি যেমন দরকার শরীরও তেমনি। একে অপরের পরিপূরক। এইজন্য সমগ্র দৃষ্টিতে মানুষের শরীর এবং বুদ্ধির মূল্য সমান। দ্বিতীয়তঃ সামাজিক দৃষ্টিতে শারীরিক ও বৌদ্ধিক উভয় কাজের দ্বারাই কোন সমাজ পূর্ণরূপ নিতে পারে। শুধু শারীরিক বা শুধু মানসিক বলে কোনও সমাজ চলতে পারে না। তৃতীয়তঃ বুদ্ধিভেদ এবং শক্তিভেদ প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু আত্মা সকলের সমান। কাজেই এই তিন দৃষ্টিতে শারীরিক এবং বৌদ্ধিক কাজের মূল্যে পার্থক্য রাখা অন্যায়। একজন অধ্যাপক একজন উকিল বা ডাক্তারের কাজের পারিশ্রমিকের সঙ্গে একজন সাধারণ কৃষক, কামার বা মুচির পারিশ্রমিকে কোনও পার্থক্য থাকা উচিত নয়। মানুষের নানা প্রকার আবশ্যকতা নিয়েই সমাজে নানা প্রকার বৃত্তি। জীবনের সমগ্র দৃষ্টিতে সমস্ত বৃত্তির আবশ্যকতাই সমান। কাজেই বৃত্তি হিসাবে পরিশ্রমের মূল্যে পার্থক্য থাকা অনুচিত। সমাজে সকলেরই বাঁচবার এবং মানবোচিত বিকাশ লাভের অধিকার সমান।

এই ভাবে জীবনের আর্থিকক্ষেত্রে সমানতা না থাকলে জাতি, বর্ণ এবং ধন হিসাবে সমাজে নানা প্রকার বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। ফলে একে অপরের—বা অধ্যাত্ম ভাষায়—এক আত্মা অপর আত্মার গুলাম হয়। বর্তমান সমাজবাদ বা সাম্যবাদ এই দোষে দুষ্ট।

১০। বহুমত ও গণতন্ত্র—

সমাজবাদী বা পুঁজিবাদী রাষ্ট্র চলে বহুসংখ্যার নির্ণয় মতে। বহু সংখ্যক লোকের সমর্থনে বা বহু সংখ্যক ভোটে কোনও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু অল্প সংখ্যার মত অগ্রাহ্য ক'রে বহু সংখ্যার মত গ্রহণ করা ন্যায়তঃ গণতন্ত্র নীতিবিরুদ্ধ। এতে অল্প সংখ্যকের হিত রক্ষা অসম্ভব। কোনও দেশে জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায় বা রাজনীতিক পক্ষ হিসাবে এই ধারায় অল্প সংখ্যকের অস্তিত্ব বজায় রাখাও অনেক ক্ষেত্রে অসম্ভব হ'য়ে পড়ে।

১১। শ্রেণীহীন সমাজ—

শ্রেণীহীন সমাজ গঠন সর্বোদয় এবং সাম্যবাদ উভয়েরই উদ্দেশ্য। উভয়েরই আদর্শ স্থিতিতে কোনও শ্রেণী থাকবে না। কিন্তু উভয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য এই যে সাম্যবাদ এই আদর্শ প্রাপ্তির জন্য বর্গ-সংঘর্ষ অনিবার্য মনে করে—যা সর্বোদয় করে না। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাম্যবাদের চরমাবস্থায় বর্গভেদ লোপ পাবে কিন্তু সর্বোদয়ে প্রথম থেকেই বর্গলোপ আরম্ভ হয়। দ্বিতীয়তঃ প্রথম থেকেই সমস্ত সৃষ্টিটী একটী পরিবার এই নীতির ভিত্তিতে সর্বোদয়ের কার্য্যারম্ভ। এতে শ্রেণী ভেদের গন্ধ আসতে পারে না। (শ্রেণীভেদ মিটাবার পন্থা সম্বন্ধে হৃদয় পরিবর্ত্তন অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

সপ্তম অধ্যায়

সর্বোদয় অর্থব্যবস্থা

আমরা পুঁজিবাদ, সমাজবাদ, সাম্যবাদ এবং সর্বোদয়ের তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করলাম। বিশ্লেষণ ক'রে দেখছি জগতের সর্বপ্রকার অশান্তির মূলে রয়েছে পুঁজিবাদ। অবশ্য সৃষ্টির স্বাভাবিক নিয়মে পুঁজিবাদের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী এবং সেই স্বাভাবিক নিয়ম ধ'রে সমাজবাদ এবং সাম্যবাদের উদয় হয়েছে। কিন্তু এখন এই ঘোর পুঁজিবাদী পরিবেশে এগুলিও পুঁজিবাদের দ্বারা প্রভাবিত। সমাজবাদ এবং সাম্যবাদ (এখন শুধু সাম্যবাদ বলাই ঠিক হবে) এখনো প্রচ্ছন্ন পুঁজিবাদ রূপে—বা আরও ঠিক হবে যদি বলা যায় সংগঠিত ধনতন্ত্ররূপেই—রয়েছে। এই পুঁজিবাদ আমাদের সমাজদেহের নাড়ি-ধমনীতে এমন ভাবে প্রবেশ করেছে যে আমরা তার স্থলে যে কোনও ব্যবস্থায় নামি না কেন তাতে পুঁজিবাদের গন্ধ থেকেই যাচ্ছে।

স্বার্থবাদী সমাজঃ—এই পুঁজিবাদের আওতায় বর্ত্তমান জগত এক বিরাট স্বার্থবাদী সমাজে পরিণত হয়েছে। কারণ পুঁজিবাদ মানেই ব্যক্তিগত সঞ্চয়বাদ, ব্যক্তিগত মালিকানাবাদ বা সোজা কথায় ব্যক্তিগত স্বার্থবাদ—অবশ্য সেই ব্যক্তিগত স্বার্থ কোথাও সমাজের পৃথক পৃথক ব্যক্তি বা শ্রেণীকে আশ্রয় করে আর কোথাও বা সংগঠিত ভাবে সম্পূর্ণ রাষ্ট্রকে আশ্রয় করে। আসলে অন্যের লাভ ক্ষতি বা হিতাহিতের বিচার না করে—ব্যক্তিগত হোক বা সম্পূর্ণ রাষ্ট্রগত হোক—স্বার্থ সিদ্ধিই এর লক্ষ্য। এই লক্ষ্য প্রাপ্তিতে ন্যায় অন্যায় বা নীতি-অনীতির কোনও বালাই থাকে না। দক্ষতা বা পারদর্শিতাই এই লক্ষ্য প্রাপ্তির একমাত্র বল ও অবলম্বন। কোথাও ব্যক্তিগত ভাবে

একে অপরকে কোথাও বহু সংখ্যক অল্প সংখ্যককে ঠেলে নিজের স্থান করে। এতে নিজেকে সকলের আগে নিয়ে যাওয়াই প্রত্যেকের লক্ষ্য। খাওয়া পরায়, বেশভূষায়, লেখাপড়ায়, খেলাধূলায়, আমোদ প্রমোদে এইভাবে জীবনের সর্বক্ষেত্রে সকলের শীর্ষে যাওয়ার জন্যই সতত প্রচেষ্টা—সতত প্রতিযোগিতা।

প্রতিযোগিতা এবং হিংসা দুইটি পরস্পর সাপেক্ষ। একের সঙ্গে অন্যের অন্যোন্য সম্বন্ধ। হিংসাই বর্ত্তমান সমাজের অবলম্বন।

আসুরি প্রবৃত্তিঃ—প্রত্যেক 'বাদের' মত পুঁজিবাদ ও একটি প্রবৃত্তির দ্যোতক। ইহা গীতায়—'ইদমদ্যময়ালব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্, ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম। অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি' বর্ণিত আসুরি প্রবৃত্তির দ্যোতক—'আজ আমার এই লাভ হয়েছে, কাল আমার এই হবে। কাল আমার এই মনোরথ পূর্ণ হবে। এই ধন আমার আছে আরও ধন আমার হবে। এই শত্রু আমি নাশ করেছি। অন্য শত্রু সকলও আমি নাশ করবো'। ইহাই আসুরি প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তিপ্রেরিত অগ্রগতিকে লোকে মনে করছে উন্নতি বা প্রগতি। প্রগতিশীলতাই সজীবতা অতএব এই ভাবে সজীব থাকা দরকার।

এটা ঠিক প্রগতিশীলতাই সজীবতা। কিন্তু এই প্রগতিমূলক প্রেরণা মানুষের আসুরি প্রবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত হ'লে বিকৃত হয়। তখন ধর্ম, অর্থ, রাজনীতি সর্বত্রই বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। উচ্চ নীচ, ছোট বড় ভাবের সৃষ্টি হয়। ধর্মে ধর্মে, জাতিতে জাতিতে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্টতার ভাব জন্মে। এইগুলির পরিপূরক হিসাবে উচ্চ নীচ বিভেদ-মূলক অসংখ্য শাস্ত্রের সৃষ্টি হয়। শাস্ত্রগুলি জনসাধারণের অজ্ঞানতার সুযোগ নিয়ে তাদের উপর কর্ত্তৃত্ব চালাবার জন্য নানা প্রকার মত, নানা প্রকার অন্ধবিশ্বাস এবং নানা প্রকার কুসংস্কারের অবতারণা করে।

পৃথিবীর বিভেদ ও বৈষম্যপূর্ণ চিত্র:—এই প্রগতি-মূলক প্রেরণার বশেই মানুষ আবশ্যকতা বোধে আর্থিক এবং রাজনীতিক ব্যবস্থার সূত্রপাত করে। কিন্তু ধর্মের মত এগুলিও আসুরি প্রবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিকৃত হয়। এই ভাবে ধার্মিক, আর্থিক, রাজনীতিক এবং সামাজিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে উচ্চ নীচ বিভেদের সৃষ্টি হয়। আজ পৃথিবীর সর্বত্রই এই বিভেদ ও বৈষম্য।

উচ্চ নীচ বিভেদ থাকলেই দ্বন্দ্ব অনিবার্য্য। এই জন্যই দেখি পৃথিবীর ইতিহাস দ্বন্দ্বে ভরা। ধর্মে ধর্মে, জাতিতে জাতিতে, রাজ্যে রাজ্যে সর্বত্রই দ্বন্দ্ব। পৃথিবীর ইতিহাসে শত শত রাজ্যের, নানা ধর্মের নানা সম্প্রদায় বা জাতির দ্বন্দ্ব উত্থান এবং পতন একটা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার।

এই জন্যই পৃথিবীর চিত্র সর্বত্রই বিভেদ পূর্ণ। কোথাও অতি ক্ষুদ্রকায় শক্তিবিহীন রাষ্ট্রের প্রাণ—নিজের অস্তিত্বটুকু বজায় রাখতে গিয়ে—ওষ্ঠাগত। আবার কোথাও বিরাট শক্তিশালী রাষ্ট্র সমস্ত বিশ্বকে নিজের কুক্ষিগত করবার জন্য উদ্যত। মধ্যে এক বিরাট ব্যবধান। এক দিকে বিরাট উত্তুঙ্গ গগনচুম্বী অট্টালিকা অন্যদিকে চালবিহীন ভগ্নকুটীর। কোথাও এক শ্রেণীর হাতে হাজার হাজার লাখ লাখ বিঘা জমি। কেউ বা লাখ লাখ কোটী কোটী টাকার মালিক আর কোথাও বা অসংখ্য ভূমিহীন নিরন্ন কৃষক একেবারে কপর্দকবিহীন নিঃসহায় নিঃসম্বল। সর্বত্রই দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার। ক্ষুদ্রের উপর রুদ্রের আক্রমণ।

পৃথিবীতে যখন মুদ্রা বা অর্থের প্রাধান্য ছিল না তখন এই আক্রমণের প্রাবল্য ছিল জমির উপর। চেষ্টা ছিল কে কত বেশী জমি নিজের অধিকারে আনতে পারবে বা রাখতে পারবে। জমি মানে রাজ্য। কাজেই তখন ছিল যুদ্ধ মানে জমি জয় বা রাজ্যজয়। তখন সেই আসুরি প্রবৃত্তি জন্ম দিয়েছিল আলেকজাণ্ডারকে, নেপোলিয়নকে এবং

অসংখ্য রাজা-মহারাজাকে। ছোট বড় রাজা মহারাজার যুদ্ধে পৃথিবীর ইতিহাস ভরা।

এখন যন্ত্রযুগ। এখন হয়েছে যন্ত্রেরই প্রাধান্য এবং যন্ত্রজাত মাল সরবরাহ ব্যাপারে বেড়েছে মুদ্রা বা অর্থের প্রাধান্য। এতেও সেই আসুরি প্রবৃত্তি প্রবেশ ক'রে এনেছে দ্বন্দ্ব—এনেছে বিরাট বৈষম্য। এখন একদিকে আমেরিকা, ইংলণ্ড, রাশিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্র যন্ত্রসম্ভারে এবং অর্থসম্পদে ভরপুর অন্যদিকে শত শত ছোট ছোট রাষ্ট্র যার না আছে যন্ত্র আর না আছে অর্থ। সর্বত্রই একে অপরকে গ্রাস করবার জন্য উদ্যত।

কোথাও লুটপাট আরম্ভ হ'লে যেমন এক দিকে প্রত্যেকে প্রত্যেকের নিজস্ব টুকু আঁকড়ে সুরক্ষিত রাখবার চেষ্টা করে এবং অন্যদিকে অপরের লুটে আনবার জন্য ঠেলাঠেলি করে আমাদের বর্ত্তমান সমাজও ঠিক তাই। দিনরাত ভূ-সম্পদ এবং অর্থ-সম্পদ বাড়াবার জন্য একটা বেশ হুড়োহুড়ি চলেছে। ছোট বড় প্রত্যেক ব্যক্তি, পরিবার, প্রদেশ, দেশ, ধর্ম, সমাজ এবং সম্প্রদায় এক একটি গণ্ডীর সৃষ্টি করেছে এবং সেই গণ্ডী বাড়াবার জন্য দিনরাত অহরহ হুড়োহুড়ি কাড়াকাড়ি, মারামারি চালিয়েছে। আসুরিপ্রবৃত্তির ইহাই লক্ষণ—ইহাই তার কাজ এবং ইহাই তার প্রেরণা। এই প্রবৃত্তির প্রাবল্যে সমাজ মনুষ্যত্বের স্তর থেকে অনেক নীচে নেমে যায়। এই প্রবৃত্তির প্রেরণায় মানুষ প্রধানতঃ নিম্ন প্রকারে সম্পত্তির অধিকারী হয় এবং নিজেকে সকলের শীর্ষে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে :—

(১) উত্তরাধিকার সূত্রে :—এই সূত্রে কোনও বালক, অক্ষম নাবালক হয়েও অগাধ সম্পত্তির মালিক হ'তে পারে।

(২) ধনবানের অনুকূলতা পেয়ে :—অনেক সময় কারও সেবায় বা কারও গুণে মুগ্ধ হয়ে অথবা নিজের কোনও বৃহত্তর স্বার্থসিদ্ধির জন্য

লোকে অপরকে প্রভূত ধনের মালিক করে। এই প্রকার সুযোগ পেয়ে অনেক সময় অতি দরিদ্রও প্রভূত ধনের মালিক হয়। তখন সেই ধনের জোরে সে নিজেকে আরও সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করে।

(৩) শারীরিক বা পাশবিক বলে :—দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার অহরহ চলেছে। দুর্বলকে ঠেলে সবল এগিয়ে চলেছে—সে দুর্বলতা শরীরের ক্ষেত্রে হোক, বুদ্ধির অথবা জ্ঞানের ক্ষেত্রে হোক।

(৪) কুটবুদ্ধিবলে অথবা বুদ্ধির বেশ্যাবৃত্তি ক'রে :—এই পরিবেশে জাল-জোচ্চোরি করা, মিথ্যা কেস সাজিয়ে অপরকে জালে ফেলা, ঘুষ আদি নানাপ্রকার অনীতির পথে ধন সঞ্চয় লোকের একটা স্বাভাবিক ধন্ধা (বৃত্তি) হ'য়ে দাঁড়ায়। উকিল, ব্যরিষ্টার, পাতি টাউট পুলিশ আদি সকলেই অনীতির ধর্মগুরু হয়। উকিলের বৈঠকখানা, আদালত আদি হ'য়ে দাঁড়ায় জালজোচ্চোরির শিক্ষাকেন্দ্র। ভায়ে ভায়ে পাড়া প্রতিবেশীতে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বিচ্ছেদ, বিরোধ, কলহ বেড়ে চলে। ফলে সমাজ যেন এক বিরাট নরককুণ্ডে পরিণত হয়। আমাদের বর্ত্তমান সমাজ যেন একটী জীবন্ত নরককুণ্ড।

(৫) অপরের বিপদ বা অসুবিধার সুযোগ নিয়ে :—কখনও স্বকৃত দোষে বা কখনও দৈবদুর্বিপাক বশতঃ মানুষ অসুবিধায় পড়ে বা বিপদগ্রস্ত হয়। কখনও কারও ঘর পুড়ে যায় বা সাংঘাতিক অসুখ বিসুখ হয়। কখনও দৈবযোগে বন্যা বা অজন্মা হয়। এইরূপ অসুবিধাগ্রস্ত হ'য়ে মানুষ সমর্থ ব্যক্তির সাহায্যপ্রার্থী হয়। তখন সমর্থ ব্যক্তিরা সুযোগ পেয়ে বিপদাপন্ন ব্যক্তির অতিশয় মূল্যবান সম্পত্তি (হয়ত ৫০০৲ টাকা মূল্যের সম্পত্তি) অতি অল্প মূল্যে (হয়ত ৫০৲ টাকায়) নিয়ে নেয়। কখনো বিপদে প'ড়ে মানুষ ঋণগ্রস্ত হয়। শেষে সুদের চাপে তার মাথা তুলবার ও ক্ষমতা থাকে না। এইভাবে একদিকে বিপদাপন্ন ব্যক্তি সর্বস্বান্ত হয় অন্যদিকে বিত্তশালীর বিত্ত বাড়তে থাকে।

গরীব ও আমিরের মধ্যে বিরাট ব্যবধান এবং দারিদ্র্যের বিষচক্র—একজনকে নীচে ঠেলে আর একজনের উপরে চড়া-ই ধনতন্ত্র-বাদ বা স্বার্থবাদের সাধারণ নিয়ম। দুজনে সমান তালে চলতে চলতে একজনকে নীচে ঠেলে ফেলা মানে একের সঙ্গে অন্যের ব্যবধান অনেক বাড়ান। দুজনের প্রত্যেকের হাতে হয়ত ১০০ ক'রে আছে। সেক্ষেত্রে পূর্বোল্লিখিত কোনও কারণে যদি একজনের হাত থেকে ৫০ চলে গিয়ে অন্যের হাতে জমা হয় তাহলে একজনের হয় ১৫০ এবং অন্যের হয় মাত্র ৫০। তখন ব্যবধান দাঁড়ায় ১৫০ এবং ৫০ এর। আবার সেই ১৫০ এর বলে যদি একজন ১০০ আয়ে সমর্থ হয় সেক্ষেত্রে অন্যে তার ৫০এর বলে হয়ত ১০ও আয় করতে পারে না। কাজেই একজন যে অনুপাতে নীচে প'ড়তে থাকে অন্যে তা থেকে অনেক উচ্চে উঠতে থাকে। এইভাবে একের উচ্ছন্নও অন্যে সম্পন্ন হ'তে থাকে। একের অহিতে অপরের হিত বা একের হানিতে অপরের লাভ ইহাই ধনতন্ত্রবাদ।

এই পরিবেশে একবার যার হাতে ভূমি বা অর্থ জমা হয় সে সেই ভূমি এবং অর্থের জোরে অন্যের চেয়ে অনুপাতে অনেক বেশী ভূমি ও অর্থ সংগ্রহে সমর্থ হয়। ফলে আজ দেখা যাচ্ছে ভূমির ক্ষেত্রে ব্যবধান বেড়ে এক শ্রেণী একেবারে ভূমিহীন এবং অন্য শ্রেণী শতশত হাজার হাজার লাখ লাখ বিঘা জমির মালিক। অর্থের ক্ষেত্রে ব্যবধান বেড়ে হয়েছে এক শ্রেণী একেবারে কপর্দকবিহীন এবং অন্য শ্রেণী লাখ লাখপতি কোটী কোটীপতি। ভূমি এবং অর্থ উভয় ক্ষেত্রে ব্যবধান বেড়ে একশ্রেণী একেবারে নিরন্ন, নিঃসম্বল, নিঃস্ব, নিরাশ্রয়—অন্যশ্রেণী সর্বসম্ভারে সুসম্পন্ন। মাঝখানে বিরাট ব্যবধানের মধ্যে ক্রমনিম্নতার এবং ক্রমউচ্চতার অগণিত স্তর ও অগণিত শ্রেণী। যেন যতটী ব্যক্তি ততটীই শ্রেণী।

এই শ্রেণীগুলির মধ্যে নিত্য সংঘাত নিত্য সংঘর্ষ—হুড়োহুড়ি কামড়াকামড়ি। 'Survival of the fittest.' 'শক্তিমানদেরই বাঁচবার অধিকার আছে, ইহাই বর্তমান সমাজনীতি ও বর্তমান অর্থব্যবস্থা।

ভূমি ও অর্থ উভয়ের সমাবেশ ও তাহার পরিণাম ঃ—ভূমিবানদের হাতে ভূমি এবং অর্থ উভয় থাকার দরুণ তারা উভয়টীকেই সঞ্চয়ের সাধনরূপে ব্যবহার করে। দেখা যায় যন্ত্রযুগে অর্থবলে তারা যন্ত্রকে অবলম্বন ক'রে নানাপ্রকার যন্ত্রজাত মাল সরবরাহের দ্বারা দেশের কুটীর শিল্পগুলি নাশ করে। ফলে হয়ত শতকরা নিরানব্বই জনের হাতের আয় এক এক জনের হাতে জমা হয়। কাজেই তখন শতকরা এক এক জনের আয় বাড়ে, সামর্থ্য বাড়ে আর নিরানব্বই জনের আয় কমে সামর্থ্যও কমে।

যন্ত্রজাত মালের ভূরি উৎপাদন এবং বিতরণের সুবিধার জন্য পাকামাল উৎপাদক হিসাবে কারখানার মালিক ম্যানেজাররা এবং বিতরক হিসাবে বড় বড় শেঠ সাহুকার, ব্যাঙ্কার দালাল এবং মহাজনেরা যায় সহরে—আর গ্রামে থাকে অধিকাংশ কাঁচামাল উৎপাদনকারী গরীব উপভোক্তা। (অবশ্য গ্রামে কিছু ধনবানও থাকে কিন্তু তারা থাকে সহরের ধনবান শ্রেণীর বাহন বা সহায়করূপে।) এই ব্যবস্থায় গ্রামপ্রধান দেশে স্বভাবতঃই অধিকাংশ গরীব লোকেই গ্রামে থাকে। কিন্তু গ্রামের কুটীর শিল্পনাশ হওয়ার ফলে এখন তাদের জীবন বা চুটী বাঁধা থাকে সহরে—শিল্পাঞ্চলে। কাজেই এই প্রথায় তাদের সব সমৃদ্ধি গিয়ে জমা হয় সহরে—শিল্পপতিদের হাতে। ফলে গ্রাম হয় শ্মশান আর সহর হয় সর্বসম্ভারে সমৃদ্ধ। ঠিক এই একই নীতিতে আজ জগতের গ্রামপ্রধান দেশগুলি (কুটীর শিল্পবিহীন দেশগুলি) উচ্ছন্ন যাচ্ছে এবং সহর-প্রধান দেশগুলি (শিল্পোন্নত দেশগুলি) সমৃদ্ধ হচ্ছে। সেইজন্যই বর্তমান জগতে ইংলণ্ড, আমেরিকা আদি সহর-প্রধান

দেশগুলি বেশ সমৃদ্ধ এবং ভারতের মত গ্রাম-প্রধান দেশগুলি আজ শ্মশানে পরিণত। আজ গ্রামগুলি যেমন সহরের হাতের পুতুল এবং সহরের শিল্পপতিদের হাতে গ্রামবাসীর জীবন বাঁধা তেমনি গ্রাম-প্রধান দেশগুলি সহর-প্রধান দেশের হাতের পুতুল এবং তাদেরই হাতে তাদের জীবন বাঁধা। পরনির্ভরতার সুযোগ পেয়ে যেমন সহর চায় গ্রামকে লুটতে তেমনি সহর-প্রধান দেশগুলিও চায় গ্রাম-প্রধান দেশগুলিকে আত্মসাৎ করতে। 'যথা পিণ্ডে তথা ব্রহ্মাণ্ডের' নীতি অনুযায়ী জগতের এই আসুরি-প্রবৃত্তি-প্রবণ পরিবেশে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, পরিবারে পরিবারে, গ্রামে সহরে, গ্রাম-প্রধান দেশ ও সহর-প্রধান দেশের মধ্যে শোষণ ও লুণ্ঠনের এই প্রক্রিয়ায় প্রত্যেকে প্রত্যেকের শত্রুরূপে পরিণত হয়েছে। এখন হাতে পেলে কেউ কাউকে সর্বস্বান্ত করতে দ্বিধাবোধ করে না। এইভাবে গরীব ও আমিরের ব্যবধান এবং দারিদ্রের বিষচক্র বেড়েই চলেছে।

শোষণমূলক সরকারঃ—এই আসুরিপ্রবৃত্তি-জনিত শত্রুতা পরিপূর্ণ পরিবেশে আমির সম্প্রদায়ের নিরাপত্তার জন্য, একের উপর অন্যের কতৃত্ব বজায় রাখার জন্য এবং শোষণের স্রোত অব্যাহত রাখার জন্য দরকার হয় এক বিরাট রাজশক্তি বা শক্তিশালী সরকার। শক্তিশালী রাজশক্তি মানে সোজা কথায় সরকারের অসংখ্য বিভাগ, বিরাট পুলিশ-বাহিনী সিপাহী ও বিরাট সৈন্যবাহিনী। এই বাহিনী বা দণ্ডশক্তিকে শিখণ্ডীরূপে সামনে রেখে সরকার-রূপ বিরাট রথ সহজে চালান যায় এবং গরীব জনসাধারণের নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে অল্পসংখ্যক আমির এবং আমলাবর্গের নিরাপদে থাকাও সহজ হয়। কিন্তু এই বিরাট বাহিনীর ব্যয়ের মোটা অংশ গরীব শ্রেণীকেই বইতে হয়। কারণ এই সংঘর্ষমূলক সমাজে গরীবের সংখ্যাই বেশী। আজ ভারত সরকারের আয়ের শতকরা ৬০ ভাগ শুধু সৈন্যবাহিনীতেই

ব্যয় হয়। এই ব্যয়ের বেশীর ভাগটা গরীব জনসাধারণের ঘাড়েই পড়ে।

এই প্রকার শোষণ-প্রবণ সরকারের গদিতে সাধারণতঃ শোষণপ্রবণ লোকেরাই অধিকার জমায়। নিজেদের অধিকার কর্তৃত্ব ও শোষণ বজায় রাখবার জন্য জনসাধারণের সুখসমৃদ্ধির দোহাই দিয়ে তারা নানাপ্রকার সরকারী বিভাগ খুলে এবং প্রত্যেক বিভাগের চাবি নিজেদেরই হাতে রাখার চেষ্টা করে। নানা ওজুহাত দেখিয়ে সরকারী আয়ের খাতা বাড়ায় তারা আর সেই আয়ের মোটা অংশ গ্রহণ করে তারাই। ফলে পুষ্টও হয় তারা। অধঃস্তন গরীব কর্মচারীরা সরকারী রথের প্রধান অবলম্বন হওয়া সত্ত্বে ও অতি অল্প অংশটুকুই পায়।

কিন্তু সরকারের উর্দ্ধতন বা অধঃস্তন সমস্ত কর্মচারীর বোঝা, সরকারের বিরাট তন্ত্র চালাবার জন্য বিরাট বিরাট অফিস আদালত ঘর দোর, সাজ সরঞ্জাম আসবাব পত্রাদির ব্যয়ের বোঝা—সব কিছুরই বেশীর ভাগ পড়ে গরীব জনসাধারণের উপর। সমাজের শ্রমশক্তির একটা বৃহৎ অংশকে এই অনুৎপাদক শ্রমে লাগতে হয়। গরীব জনসাধারণ নায্য জীবনবেতন (living wages) না পেয়ে অভুক্ত বা অর্ধভুক্ত থেকে এই কাজ করতে বাধ্য হয়। তাছাড়া সরকারী অফিসারদের ঘুষ আদি উপরি আয় ত আছেই। এইভাবে একদিকে নিজেদের বোঝা অন্যদিকে সরকারের বোঝা। এই উভয় বোঝার চাপে প'ড়ে জনসাধারণ পিষ্ট হ'তে থাকে। গরীব ও আমিরের ব্যবধান বাড়ার ইহাও অন্যতম কারণ।

অনুৎপাদক শ্রম ঃ—এইখানেই শেষ নয়। এই প্রকার সরকারের রাজত্বে উৎপাদক শ্রমের মহত্ব লোপ পায়। সরকারের কোনও বিভাগে উৎপাদক শ্রমের অবকাশ থাকে না। প্রায়ই সমস্ত কর্মচারী উৎপাদক-শ্রম থেকে দূরেই থাকে এবং শ্রমকে ঘৃণার চোখেই দেখে।

কাজেই এদের ভরণপোষণের জন্য আবশ্যক উৎপাদক শ্রম গরীব জনসাধারণকেই করতে হয়। একদিকে নিজেদের ভরণপোষণের বোঝা অন্যদিকে এই সব বাবুদের বোঝা ব'য়ে চলতে চলতে এদের জীবনান্ত হয়। অনেক সময় নিজেদের অভুক্ত বা অর্ধভুক্ত রেখে নিজেদের উৎপাদক শ্রমজনিত ভাল ভাল জিনিষগুলিও অতি অল্প মূল্যে তাদের হাতে সঁপে দিতে বাধ্য হয়। ভাল ফলটী ভাল মাছটী এবং দুধ ঘি ইত্যাদি সমস্ত ভাল জিনিষ তাদেরই বাড়ী পৌঁছে আসে।

দ্বিতীয়তঃ বিরাট সরকার মানে বিরাট কেন্দ্রীয় অর্থব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায়—মাল সরবরাহকার, অফিসার, ব্যবসায়ী, দালাল আদি বিতরক সম্প্রদায় এবং বিতরণ ব্যবস্থার আবশ্যকীয় প্রায় সমস্ত আয়োজন—রাস্তাঘাট, যানবাহন, গুদাম অফিস আদির জন্য আবশ্যক শ্রমের প্রায় সমস্তটাই অনুৎপাদক শ্রমের অন্তর্ভুক্ত। এই সব অনুৎপাদক শ্রমে রাষ্ট্রের প্রভূত শ্রম শক্তির অপচয় হওয়ার ফলে উৎপাদক শ্রম কম হয়। ফলে রাষ্ট্রে হয় উৎপাদক শ্রমোপলব্ধ বস্তুর অভাব। আর যতটুকুই হয় তার বেশীর ভাগ এবং ভাল অংশটুকু ধনবানদেরই ভাগে পড়ে। কারণ উৎপাদক-শ্রম-রত পরনির্ভরশীল গরীব জনসাধারণের পক্ষে সেগুলি ভোগ করা সম্ভব হয় না।

তৃতীয়তঃ সরকারের শিক্ষাপদ্ধতিতে উৎপাদক শ্রমের গুরুত্ব থাকে না। অপরের উৎপাদক শ্রমের উপর নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার শিক্ষাই সরকারী শিক্ষার সিলেবাস রূপে গৃহীত হয়। ফলে কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান আদি বিষয় গবেষণামূলক এবং উৎপাদনমূলক না হ'য়ে শোষণমূলক এবং অনুৎপাদনমূলক হ'য়ে দাড়ায়। স্কুল কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত সকলেই বিনাশ্রমে সমাজের পরগাছারূপে পরের শোষণ ক'রে নিজে পুষ্ট হ'তে থাকে।

আমিরের অনুকরণে গরীবের নাশ ঃ—এইভাবে তাদের সমস্ত

বোঝা গরীব জনসাধারণের উপরেই পড়ে। তাছাড়া সরকারী অফিসার, ধনবান সম্প্রদায় এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এই অনুৎপাদক শ্রমের বা শ্রমবিমুখতার অনুকরণ করতে গিয়ে জনসাধারণ আরও বিপদে পড়ে। তাদের একমাত্র সম্বল শ্রমশক্তিটুকুও তারা হারায় এবং সঙ্গে সঙ্গে তারা নানাপ্রকার বিলাসব্যসনেরও শিকার হ'য়ে পড়ে। তখন দারিদ্র্যের আর সীমা থাকে না।

ভারত প্রভৃতি দেশ আজ দারিদ্র্যের এই বিষচক্রে এবং এই আসুরি প্রবৃত্তির খপ্পরে। ইংলণ্ড আমেরিকা আদি পুঁজিবাদী বা স্বার্থবাদী শিল্পোন্নত দেশগুলির অনুকরণ করতে গিয়ে তারা আজ সর্বস্বান্ত। তাদের অনুকরণে ভারত প্রভৃতি দেশে বড় বড় শিল্পপতি, ভূমিপতি, বড় বড় কলকারখানা এবং বড় বড় শহরের সৃষ্টি হয়েছে। সর্বনিম্নস্তরে রয়েছে লক্ষ লক্ষ গ্রাম এবং গ্রামের অসংখ্য জনসাধারণ। জনসাধারণ বাবুদের, গ্রাম শহরের এবং শিল্পে অনুন্নত দেশ (যেমন ভারত) শিল্পোন্নত দেশের (আমেরিকা ইংলণ্ড আদির) অনুকরণ করতে গিয়ে জনসাধারণের অর্থ বাবুদের হাতে, গ্রামের অর্থ শহরে এবং শিল্পে অনুন্নত দেশের অর্থ শিল্প-সমৃদ্ধ দেশে গিয়ে জমা হচ্ছে। ফলে সর্বনিম্নস্তর গরীব দেশের জনসাধারণের দারিদ্র এবং সর্বনিম্নস্তর ও সর্বোচ্চ স্তরের মধ্যে ব্যবধান বেড়ে চলেছে। রুশ দেশ এই ব্যবধান ও বৈষম্য দূর করবার সঙ্কল্প নিয়ে কাজে নেমেছে কিন্তু জনমন থেকে পুঁজিবাদীবৃত্তি বা স্বার্থবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে দুরীভূত না হওয়ার ফলে সেখানে এখনও এই ব্যবধান যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান।

স্বার্থ মনোবৃত্তিঃ—আজ দেখা যাচ্ছে ধনতন্ত্রবাদী হোক বা সাম্যবাদী হোক সকল ব্যবস্থাতেই মানুষে মানুষে বৈষম্যের অবকাশ রয়েছে। একের ধ্বংসে অন্যের উন্নতি হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে সকলের মূলে রয়েছে সেই আসুরি স্বার্থ মনোবৃত্তি। এই বৃত্তি ক্ষুদ্র ব্যক্তি থেকে আরম্ভ

ক'রে বিশাল বিশাল রাষ্ট্র পর্যন্ত সর্বত্র সমভাবে বিদ্যমান। এই মনোবৃত্তি সমগ্র মানবসমাজকে গ্রাস করেছে। ফলে জগতের এই দুরবস্থা।

স্বার্থের গণ্ডী :—এই স্বার্থ মনোবৃত্তির জন্ম ব্যক্তিগত মালিকানা-বোধ থেকে বা ধর্মশাস্ত্রীয় ভাষায় স্বামিত্ব বা আমিত্ববোধ অথবা অহংবোধ থেকে। সেই অহংবোধের প্রেরণায় 'আমার শরীর', 'আমার বিদ্যাবুদ্ধি 'আমার ঘর,' 'আমার সম্পত্তি', 'আমার স্ত্রী,' 'আমার ছেলে,' 'আমার পরিবার' প্রভৃতি এক এক গণ্ডীর সৃষ্টি করি। সেই গণ্ডীর আকার বেড়ে হয়ত 'আমাদের জাতি,' 'আমাদের সমাজ', বা 'আমাদের দেশ' এবং এই ক'রে 'আমাদের মানবজাতি' পর্যন্ত পৌছায় কিন্তু থাকে এক একটি গণ্ডী।

সেই গণ্ডীর ভিতরে থেকে আমরা "সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাব-মব্যয়মীক্ষতে, অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্'—অব্যক্ত হ'তে স্থাবর পর্যন্ত সর্বত্র এক অবিভক্ত অক্ষর আত্মবস্তু—এই মহান সাত্ত্বিক জ্ঞানের আলোক পাই না। রাজসিক এবং তামসিক জ্ঞানের অন্ধকারে পথ হারাই। আমরা ভুলে যাই সারা সৃষ্টি এক অখণ্ড। একটিই পিণ্ড, জীবমাত্রেরই আত্মা অভিন্ন। 'সমং সর্বেষুভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমে-শ্বরম'। 'যত্র জীব তত্র শিব।' একই পিণ্ডের বিভিন্ন অংশ পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধসূত্রে রচিত ও গ্রথিত। প্রত্যেক জীবের সঙ্গে প্রত্যেকের অন্যোন্য সম্বন্ধ। পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। 'জীব জীবস্য জীবনম্'—একের জীবন অন্যের জীবনের উপর নির্ভর করে। একটী জীব অন্য জীবকে বাঁচায় এবং অন্য জীবের উপর তার জীবন নির্ভর করে। একটী জীব শত শত জীবের জন্ম দেয় এবং বাঁচায় আর তার জীবন অন্য শত শত জীবের জীবনের উপর নির্ভর করে। 'পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ পরম শ্রেয়ম-বাপ্সথঃ।' এই নীতি হিসাবে সৃষ্টির চক্র চলতে থাকে। সৃষ্টির ইহাই মৌলিক নিয়ম।

কিন্তু সেই অহংবোধ বা অজ্ঞতার বশে আমরা সারা সৃষ্টি যে এক পরিবার একথা ভাবতে পারি না। আমরা যখন যা কছু ভাবি বা করি সেই সমস্ত গণ্ডীর ভিতরে থেকেই এবং সেই সমস্ত গণ্ডীকে কেন্দ্র করেই। সব সময়ই আমাদের কাজ আরম্ভ হয় সেই সর্বনিম্ন 'আমি'কে কেন্দ্র করে—'আত্মানং সততং রক্ষেৎ' এই নীতি বাক্যকে অবলম্বন ক'রে।

এই নীতি বাক্য যখন ক্ষুদ্র 'আমি'কে কেন্দ্র করে তখন আমি আমার বক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কথাই ভাবি। তখন আমার পরিবারের কথা পর্যন্ত ভাবতে পারি না। এই 'আমি' যখন আমার পরিবারকে কেন্দ্র করে তখন আমি আমার পরিবারের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বা উন্নতির কথাই ভাবি। তখন অন্য পরিবারের কথা ভাবতে পারি না। এই ভাবে আমি যতই বাড়ি না কেন কোনও ক্ষেত্রে আমার সেই ক্ষুদ্র 'আমি' বা অহং বোধের উর্ধ্বে যেতে পারি না। এইভাবে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, পরিবারে পরিবারে, জাতিতে জাতিতে, বা দেশে দেশে ভিন্নতা আসে এবং এই ভিন্নতাবোধ থেকেই স্বার্থসংঘাতের সৃষ্টি হয়। কাজেই এই গণ্ডীর আকার সারা মানব সমাজ পর্যন্ত পৌছেও হয়ত স্বার্থসংঘাত থেকে মুক্ত হয় না! তখন মানব সমাজের সঙ্গে পশু বা উদ্ভিদ সমাজের স্বার্থসংঘাত হয়। তখন এই স্বার্থ সংঘাত আমাদের নাশের বা অবনতির কারণ হ'য়ে দাঁড়ায়। আমরা জীবশক্তির স্থলে যন্ত্রশক্তির এবং জৈব পদার্থের জায়গায় রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার ক'রে জীবকুলের ধ্বংস মানে নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনি। ট্রাক্টার এবং রাসায়নিক সারের কুফল আজ কে না জানে? আমরা সৃষ্টির সারত্ব বজায় রাখছি কি?

কাজেই দেখা যাচ্ছে সৃষ্টির সারত্ব বজায় রেখে সর্বপ্রকার শোষণহীন বৈষম্যবিহীন অহিংস এবং শান্তিপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থার মূলে দুটী জিনিষ

দরকার ঃ—(১) 'আমিত্ব' বা 'স্বামিত্ব' বিসর্জন এবং (২) সমস্ত সৃষ্টিই এক অখণ্ড—এক পরিবার এই বোধ। 'বসুধৈব কুটুম্বকম' এই নীতি। ইহাই সাম্যযোগ। এই যোগমতে জীবমাত্রেরই আত্মা এক এবং অভিন্ন। মানুষের আত্মা এবং প্রাণীমাত্রেরই আত্মার মধ্যে কোনও মৌলিক ভেদ নাই। তবে তফাৎ এই যে মানুষের আত্মার বিকাশ হয়। মানুষ দেবত্বলাভ করতে পারে কিন্তু পশু পারে না।

এই দুটী মূলতত্ত্বের আধারেই সর্বোদয় সমাজ ব্যবস্থা এবং সর্বোদয় অর্থব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় কোথাও শাসন শোষণ বা বৈষম্যের অবকাশ নাই। এই প্রকার সমাজ ব্যবস্থার বাস্তবরূপ দেওয়ার উপায় প্রধানতঃ দুইটী—সামাজিক এবং আর্থিক সাম্য স্থাপন।

সর্বোদয়ের কর্মপন্থা

১। **সামাজিক সাম্য স্থাপন**—অসাম্য বা বৈষম্য থেকেই শাসন এবং শোষণের জন্ম। দুটী পরস্পর সাপেক্ষ। যেখানে বৈষম্য সেখানেই শাসন এবং শোষণ। ধনী দরিদ্র, উচ্চ নীচ, ইতর ভদ্র, অবর্ণ সবর্ণ ভেদাভেদ থাকলেই শাসন এবং শোষণ অথবা শাসন বা শোষণ অনিবার্য্য।

শাসন এবং শোষণের দৃষ্টিতে বৈষম্য তিন প্রকার ঃ—ধন বৈষম্য, পদ বৈষম্য এবং বর্ণ বৈষম্য। ধন মর্যাদায় এবং পদমর্যাদায় মালিক বা সরকারের ব্যবস্থাপকবর্গ এবং বর্ণ মর্য্যাদায় সমাজের উচ্চ বর্ণের বা উচ্চ শ্রেণীর লোকে নিম্নশ্রেণীর লোকের উপর যদৃচ্ছ কর্তৃত্ব চালায় এবং নানা ভাবে শোষণের চেষ্টা করে।

(১) বর্ণ বৈষম্য ঃ—বৃত্তিভেদে বর্ণ বৈষম্য মূলতঃ কৃত্রিম এবং ধর্ম বিরুদ্ধ। কেননা প্রকৃতির কোলে জীবের জন্ম বটে কিন্তু অন্যান্য জীবের

ন্যায় মানুষকেও স্ব স্ব চেষ্টায় জীবিকার্জন করতে হয়। জীবিকার্জন জীবমাত্রেরই জীবন রক্ষার স্বাভাবিক ধর্ম। এই স্বাভাবিক ধর্ম রক্ষার তাগিদে মানুষকে কোনও না কোন বৃত্তি অবলম্বন করতে হয়। বিভিন্ন মানুষ তার স্বাভাবিক রুচি এবং শক্তি অনুযায়ী বৃত্তি অবলম্বন করবে ইহাই তার পক্ষে স্বাভাবিক। পন্থা হিসাবে ইহাই উৎকৃষ্ট পন্থা এবং ধর্ম হিসাবে ইহাই স্বাভাবিক ধর্ম বা তার স্বধর্ম। কেননা ব্যক্তির স্বাভাবিক শক্তি এবং স্বাভাবিক রুচিই তার স্বাভাবিক ধর্ম বা স্বধর্ম। এই স্বাভাবিক ধর্ম হিসাবে সমাজে ব্যক্তি মাত্রেরই বৃত্তি নির্ণয় হওয়া বাঞ্ছনীয়। জীবনের মৌলিক নীতির বিরোধী না হলে যে কোনও বৃত্তিই মানুষের পক্ষে গ্রহণীয় বা করণীয়। জীবিকার বৃত্তিতে উচ্চ নীচ ভেদাভেদের নাম-গন্ধ আসাই অবাঞ্ছনীয়। ভাঙ্গি, তাঁতি, চাষী, মুচি সবই এক। জন্মগত বা আহৃত উচ্চনীচ ভেদাভেদ ব'লে কিছুই নাই। জন্মলাভ কালে সব মানুষ স্বতঃই সমান। একের আত্মা অপর থেকে একেবারে অভিন্ন।

বৃত্তিটা বড় কথা নয়। বড় কথা হচ্ছে বৃত্তিটা মানব জীবনের মৌলিক নীতির অনুকূল কিনা। তা না হলে যে কোনও বৃত্তি—এমন কি ব্রাহ্মণের বৃত্তি ও ঘৃণ্য এবং পরিত্যাজ্য।

এই নীতির ভিত্তিতে অর্থ ব্যবস্থা হ'লে সমাজে কোনও প্রকার বৈষম্য বা বৈষম্যজাত দুর্নীতি আসতে পারে না এবং স্বাভাবিকভাবে আর্থিক সাম্য রক্ষিত হয়।

সত্যকার শোষণহীন সমাজ তখনই সম্ভব হবে যখন কোনও কর্মে বৃত্তিগত ভেদ থাকবে না। জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় প্রায় সকল কাজে সকল লোকে অংশ গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করবে না এবং বৃত্তি মাত্রেরই আর্থিক এবং সামাজিক মূল্য সমান থাকবে। একজন উকিল বা একজন অধ্যাপকের জীবন-বেতন (Living wages) এবং একজন মুচি বা একজন নাপিতের জীবন-বেতনে কোনও পার্থক্য থাকবে না।

(২) পদ বৈষম্য :—মানুষে মানুষে জ্ঞান, বুদ্ধি, বিচারশক্তি বা শারীরিক শক্তি ইত্যাদিতে তারতম্য থাকা সত্ত্বেও ও সামাজিক জীবনে সকলের আবশ্যকতা সমান এবং সেই হিসাবে সকলের মূল্যও সমান। একক ভাবে হাতের পাঁচটি আঙ্গুল সমান নয় কিন্তু কার্য্যের ক্ষেত্রে পাঁচটির আবশ্যকতা সমান।

কোনও কারখানা বা সরকারের বিভিন্ন কাজের জন্যই বিভিন্ন বিভাগ। বিভিন্ন বিভাগ নিয়েই বিভিন্ন পদ। কিন্তু সমগ্র ভাবে কারখানা বা সরকারের দৃষ্টিতে সকলের আবশ্যকতা সমান। শ্রমিক ও ব্যবস্থাপক নিয়েই কারখানা আর মন্ত্রী এবং অধঃস্তন কর্মচারী নিয়েই সরকার। কাজের সুবিধার জন্য পদের পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু পদ-পার্থক্য বশতঃ পদবৈষম্য অসমীচীন। পদের পার্থক্য বশতঃ কারখানার সাধারণ শ্রমিকের জীবন-বেতন (Living wages) মালিক বা ব্যবস্থাপকের জীবন-বেতনে অথবা রাজ্য পরিচালনায় মন্ত্রী এবং অধঃস্তন কর্মচারীদের জীবন-বেতনে কোনও বৈষম্য থাকা একেবারে অবাঞ্ছনীয় এবং অমানুষিক। স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্ব স্ব বিভাগে অথবা স্ব স্ব পদে অধিষ্ঠিত থেকে প্রত্যেকেরই মানুষের মত বাঁচবার এবং প্রত্যেকেরই আত্মবিকাশ করবার সমান সুযোগ থাকা উচিত।

(৩) ধন বৈষম্য :—গান্ধীজীর অছিতত্ত্বের (Trusteeship theory) আধারে কারও কাছে বেশী বা কারও কাছে কম ধন থাকলে শোষণের প্রশ্ন উঠেনা ; কিন্তু অধিকার হিসাবে ধনের বৈষম্য থাকলে শোষণের প্রশ্ন আসে। অছিতত্ত্ব অনুযায়ী কারো কাছে দেশের সমস্ত সম্পদ থাকলেও সমাজেরই একজন ব্যক্তি হিসাবে নিজের কর্তব্য সম্পাদন করার সঙ্গে সঙ্গে সে নিজের জন্য ততটুকু গ্রহণ করে, যতটুকু সমস্ত সমাজের দৃষ্টিতে তার গ্রহণ করা উচিত। তার বেশী সে নেয় না বা সেই সম্পদের সূত্রে অপরকে শোষণ করে না অথবা সেই সম্পদের

জোরে অপরের উপর কর্তৃত্ব চালায় না—বর্তমান ধন বৈষম্যে ধনবান ও ধনহীনে যা হয়ে থাকে।

আমার যা কিছু শক্তি সামর্থ্য সবই সমাজের জন্য—ইহাই অছিতত্ত্ব। এই অছিতত্ত্বে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি হচ্ছে ব্যক্তিগত স্বার্থকে সমাজের চরণে অর্পণ করে দেওয়া।

সামাজিক সাম্যে মূলকথা এই যে মানুষে মানুষে শারীরিক মানসিক বা আধ্যাত্মিক যতই অসমানতা থাকুক না কেন জীবন ধারণের জন্য (জীবননীতির অনুকূলে) যে যে কোনও বৃত্তি অবলম্বন করুক না কেন, সামাজিক ব্যবস্থার জন্য যে যে কোনও পদে আসীন হউক না কেন অথবা যার কাছে ভৌতিক সম্পদ যাই থাকুক না কেন, মানুষ হিসাবে সকলের মর্য্যাদা সমান। 'ন মানুষাৎ শ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ' এই তত্ত্ব সকলের পক্ষে সমান ভাবে প্রযোজ্য। প্রত্যেকে নিজের শক্তি সামর্থ্য মত কাজ করবে আর তার জীবন নির্বাহের মত গ্রহণ করবে। ব্যক্তির পার্থক্য এবং শক্তির পার্থক্য অনুসারে সেবার পার্থক্য খুবই হতে পারে। কিন্তু জীবিকার মৌলিক প্রয়োজনে কোনও পার্থক্য থাকবেনা। কেননা সেবা নৈতিক বস্তু এবং পোষণ ভৌতিক বস্তু। নৈতিক বস্তুর মূল্য ভৌতিক বস্তুর দ্বারা নির্দ্ধারিত হ'তে পারে না।

প্রথমতঃ সকলের বাঁচবার অধিকার সমান। খাদ্যবস্তু বা জীবন ধারণের মৌলিক বস্তু সকলে সমানভাবে উপভোগ করবে কিন্তু এই সমানতা গণিতের হিসাবে জেলের কয়েদীদের খাদ্য বিতরণের সমানতা নয়—কারও সাতখানি রুটির দরকার থাকলেও সে পাবে পাঁচখানি আর কারো তিনখানি দরকার থাকলেও তার পাঁচখানি। (গণিতের হিসাবে রুটি এবং কয়েদীর সংখ্যায় ভাগ করলে যা হয়)। কেননা ভগবান কোনও ফ্যাক্টরীর এক ছাঁচে মানুষ ঢালাই করেন নি। এই সমানতা হবে পরিবার-নীতি হিসাবে। ব্যক্তির শরীর পোষণের

জন্য যার যতটুকু দরকার (পরিবারের সামর্থ্য অনুযায়ী) তাকে সেই ভাবে দেওয়া—ইহাই পরিবার নীতি। মা পরিবারের সামর্থ্য অনুযায়ী হয়ত দুগ্ধপোষ্য শিশুকে শুধু দুধ, তদপেক্ষা বড় ছেলেকে কিছু দুধ ও কিছু রুটি এবং সর্বাপেক্ষা বড় ছেলেকে কেবল রুটীই খেতে দেয়। এইটীই বিবেকযুক্ত সমতা বা আধ্যাত্মিক সমতা। সমস্ত সমাজই এক পরিবার এবং সমস্ত সমাজে এই বিবেকযুক্ত সমতা বা আধ্যাত্মিক সমতা স্থাপনই সর্বোদয় সমাজ ব্যবস্থার লক্ষ্য। পদ, বর্ণ বা বৃত্তি ভেদে বিতরণ ব্যবস্থা অত্যন্ত অমানুষিক। কেননা মানুষ পদ বর্ণ বা বৃত্তি এ সবারই উর্দ্ধে। দ্বিতীয়তঃ যে যেকোনও কাজ করুক না কেন, সর্বোদয় সমাজে তার ব্যক্তিত্ব বিকাশের পূর্ণ অবকাশ থাকবে।

২। **আর্থিক সাম্য স্থাপন** ঃ—যে কোনও কেন্দ্রীয় ব্যবস্থায় বৈষম্য এবং বৈষম্য জনিত নানাপ্রকার দুর্গুণ থাকা স্বাভাবিক। সেইজন্য সর্বোদয় অর্থ ব্যবস্থায় বিকেন্দ্রীকরণ একটী অতি মহত্ত্বপূর্ণ ব্যাপার।

যে কোনও কেন্দ্রীয় ব্যবস্থায় মুষ্টিমেয় লোকের হাতেই বহুসংখ্যক লোকের ভার আসে। তাতে সেই মুষ্টিমেয় লোকের দ্বারা বহু সংখ্যক লোকের শোষণের অবকাশ থাকে। শোষণের অবকাশ থাকলেই সাধারণতঃ মানুষ সুযোগ পেয়ে শাসনদণ্ড ও হাতে নেয়। কাজেই ব্যবস্থা এমন হওয়া দরকার যাতে কেউ কোথাও শোষণের সুযোগ না পায় বা যতদূর সম্ভব কম পায়। তা করতে হ'লে ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ ছাড়া গত্যন্তর নাই। আর্থিক ক্ষেত্রে বৈষম্য থাকলে উচ্চনীচ ভেদ এবং পরাশ্রয়ী বৃত্তির সৃষ্টি হয়। ফলে এক আত্মা অন্য আত্মার দাস হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই চাই বিকেন্দ্রীত ব্যবস্থা।

বিকেন্দ্রীত ব্যবস্থার প্রকার ঃ—এই ব্যবস্থা দুই প্রকার। স্বাবলম্বন-মূলক এবং সমবায়-মূলক। প্রথমটী কেন্দ্রবহির্মুখী এবং দ্বিতীয়টী

কেন্দ্রাভিমুখী। যতদূর সম্ভব কেন্দ্রবহির্মুখী ব্যবস্থাই সর্বোদয় সমাজের কাম্য এবং পারতপক্ষে কেন্দ্রাভিমুখী ব্যবস্থা বর্জনীয়।

কেন্দ্রবহির্মুখী ব্যবস্থা পারতপক্ষে প্রত্যেক ব্যক্তি, পরিবার ও গ্রামকে স্বাবলম্বী করতে চায়। যার দ্বারা যে কাজ করা সম্ভব তাকে সেই কাজ করবার পূর্ণ অবকাশ দেয় যাতে ছোট বড়, সক্ষম অক্ষম প্রত্যেকটী ব্যক্তি প্রত্যেকটী পরিবার এবং প্রত্যেকটী গ্রাম স্বাবলম্বী হওয়ার পূর্ণ সুযোগ পায়। কোনও ক্ষেত্রে কেউ যেন কেন্দ্রবহির্মুখী ব্যবস্থার এতটুকু সুযোগ থেকেও বঞ্চিত না হয়। ঢেঁকীতে ধান ভেনে বা যাঁতায় আটা পিষে যদি প্রত্যেকটী পরিবার নিজেদের আবশ্যকীয় চাউল এবং আবশ্যকীয় আটার ব্যবস্থা ক'রে নিতে পারে সে ক্ষেত্রে গ্রামের সমস্ত পরিবার বা কয়েকটী গ্রামের সমবায়ে কেন্দ্রাভিমুখী ব্যবস্থায় ধান ভানার কল (বাণীমিল) ? বা আটা পিষাকল অথবা ডালভাঙ্গা কল চালাবে না। বরং ঢেঁকীতে বা যাঁতায় আবশ্যক পরিবর্ত্তন ক'রে এই ধান ভানা বা আটা পিষা আদি কাজ গুলি আরও সহজে ও আরও দ্রুত করবার চেষ্টা করবে। সব সময়ই চেষ্টা থাকবে অনায়াসসাধ্য এবং সহজসুলভ এমন সাধনের প্রবর্ত্তন করা যাতে সমাজের প্রত্যেকটী ব্যক্তিকে যতদূর সম্ভব স্বাবলম্বী ক'রে তোলা যায়। আজ ঢেঁকী পরিবার স্বাবলম্বন পর্যন্ত পৌঁছেছে। আমাদের লক্ষ্য এবং চেষ্টা থাকবে কাল তাকে ব্যক্তি স্বাবলম্বনের পর্যায়ে আনা। আজ তাঁত গ্রাম স্বাবলম্বন বা পরিবার স্বাবলম্বন পর্যন্ত পৌঁছেছে। আমাদের চেষ্টা এমন হবে যেন কাল থেকে আমরা অন্যান্য যাবতীয় কাজের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকে নিজের কাপড়টাও নিজে বুনে নিতে পারি। পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে আজ যার হাতে যত কাজ থাকুক না কেন বর্তমান সূতা কাটার সাধনের দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তি তার অন্যান্য যাবতীয় কাজের সঙ্গে সঙ্গে নিজের কাপড়ের মত আবশ্যক সূতা কেটে

নিতে পারে। এখন আমাদের গবেষণা এমন হবে যাতে আরও সহজ-সুলভ এবং আরও জটিলতা বিহীন সাধন আবিষ্কার ক'রে আরও সহজে এই কাজ ক'রে নিতে পারি। এই ভাবে প্রত্যেকটী কাজ কেন্দ্র-বহির্মুখী বা ব্যক্তি স্বাবলম্বন মূলক করাই সর্বোদয় ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য।

আজ প্রত্যেক পরিবারের পক্ষে আবশ্যকীয় তেল বা আবশ্যকীয় হাঁড়িকুড়ি তৈরী করা সম্ভব নয় কিন্তু প্রত্যেক গ্রামে সম্ভব। সে ক্ষেত্রে এই অর্থ ব্যবস্থা অয়েল মিলের তেল এবং এ্যালুমিনিয়মের হাঁড়ি-কুড়ি গ্রামে আসতে দিয়ে তেলী কুল এবং কুমোর কুলকে বেকারত্বের কবলে ফেলবেনা। বরং চেষ্টা ক'রে আরও উন্নত ধরণের ঘানী এবং উন্নত ধরনের অল্পায়াসসাধ্য হাঁড়িকুড়ি তৈরীর প্রণালী আবিষ্কার করবে। এই অর্থব্যবস্থা দেশের বৈজ্ঞানিক সমাজকে প্রোৎসাহন দিয়ে এমন উন্নত ধরনের যন্ত্র চাইবে যাতে ব্যক্তি এবং সমাজের যাবতীয় আবশ্যকতায় যতদূর সম্ভব প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে স্বাবলম্বী হওয়া সম্ভব। চেষ্টা করলে বিজ্ঞান এই কাজে মহান কৃতিত্ব দেখাতে পারবে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। লোককে বেকার করায় এ-যুগে বিজ্ঞান যেমন চরম সীমায় পৌঁছেছে পরবর্তী যুগে লোককে স্বাবলম্বী করার কাজে তার চেয়েও বেশী দূর এগোতে পারবে। কারণ মানুষের জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা দিনে দিনে বাড়ে।

সর্বোদয় অর্থব্যবস্থায় যন্ত্র—সর্বোদয় অর্থব্যবস্থায় যন্ত্রের আবশ্যকতা ত আছেই; কিন্তু যন্ত্র হবে কেন্দ্রবহির্মুখী—ব্যক্তি-স্বাবলম্বনমুখী। তার সর্বাধিক চেষ্টা থাকবে প্রথমে ব্যক্তিকে স্বাবলম্বী করা। যে ক্ষেত্রে না পারবে পরিবারকে স্বাবলম্বী করবার চেষ্টা করবে। তা না পারলে গ্রামকে। এই ভাবে এ চলবে। ব্যক্তিকে বেকার করে দিতে পারে বা ব্যক্তিকে শোষণ করতে পারে এমন যে কোনও যন্ত্র এই অর্থব্যবস্থায় একেবারে বর্জনীয়।

যন্ত্র তিন প্রকার—সময় সাধক, সংহারক এবং উৎপাদক। ক্ষেত্র-বিশেষে মোটর ট্রেন এবং বিমানাদি সময় সাধক যন্ত্রের আবশ্যকতা আছে কিন্তু মানবসমাজে কামান বন্দুক আদি সংহারক যন্ত্রের আদৌ আবশ্যকতা নাই। উৎপাদক যন্ত্র পূরকও মারক হিসাবে দুই প্রকার।

ট্রাক্টর উৎপাদক যন্ত্র। যে জনবহুল দেশে (যেমন ভারতে) এই যন্ত্র মনুষ্যশক্তি ও পশুশক্তিকে বেকার ক'রে দেয়, সে দেশে ইহা মারক এবং সর্বথা বর্জনীয়। আর যে দেশে (যেমন আমেরিকা) লোকসংখ্যার অনুপাতে জমি যথেষ্ট বেশী সে দেশের পক্ষে উহা পূরক ও গ্রহণীয় হতে পারে। কিন্তু সে দেশের সেই ট্রাক্টর দ্বারা উৎপন্ন অধিক মাল যদি অন্য কোনও দেশের লোকশক্তি এবং পশুশক্তিকে বেকার করে তাহলেও তাহা মারক। সমগ্র মানব জাতির পক্ষে যে যন্ত্র পূরক তাহাই গ্রহণীয় আর যা মারক তাহা বর্জনীয়। কেন্দ্রবহির্মুখী বা ব্যক্তি-স্বাবলম্বনমুখী যন্ত্রই সর্বাবস্থায় গ্রহণীয়।

শরীরশ্রম ঃ—সর্বোদয় সমাজব্যবস্থায় স্বাবলম্বনের অবলম্বনই হলো শরীরশ্রম। যার যত বিদ্যাবুদ্ধি বা জ্ঞান থাকুক না কেন যে যত সেবাপরায়ণ বা রাজনীতিবিদ হউন না কেন শরীরধারী হিসাবে শরীরধর্ম পালন এবং সমাজের প্রতি কর্তব্য সম্পাদনের জন্য প্রত্যেকের পক্ষে উৎপাদক শরীরশ্রম একান্ত দরকার। শরীরশ্রমই প্রত্যেকের স্বাভাবিক ধর্ম। উৎপাদক শরীরশ্রম না ক'রে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে গেলেই অপরের শ্রমোপার্জিত অংশে ভাগ বসাতে হয়। এই অর্থ ব্যবস্থায় শরীরশ্রমের দ্বারা সমাজের যথোচিত কর্তব্য সম্পাদন না ক'রে অপরের অংশে ভাগ বসান মানে চুরি করা বা অপরকে শোষণ করা। শোষণ-হীন এবং শ্রেণীহীন সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে শরীরশ্রম অনিবার্য্য এবং শরীরশ্রমের দ্বারাই ধনবৈষম্য, পদবৈষম্য, বৃত্তিবৈষম্য আদি সমস্ত বৈষম্য মিটান সম্ভব।

এইভাবে বিকেন্দ্রীত সমাজব্যবস্থায় স্বাবলম্বন এবং শরীরশ্রম ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত।

স্বাবলম্বনমুখী সমাজের স্বরূপ

(১) সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির সুবিধার দিকে নজর রাখার সুযোগ থাকে।

(২) উৎপাদন এবং বিতরণে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ থাকে। অধিকার বা সত্তা সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তিতে ছড়িয়ে থাকে। কাজ এবং ব্যবস্থা কোনও ব্যক্তির বা দল বিশেষের উপর নির্ভর করে না। কামার, কুমোর, তাঁতি, মুচি আদি প্রত্যেকেই সামাজিক নিয়মে যে যার বৃত্তি করতে থাকে। উৎপাদনটাই বিতরণের একটা পদ্ধতি হয়ে দাঁড়ায়। আসলে দুটার কোনও পৃথক রূপ থাকে না। সমাজ ব্যবস্থা ও অর্থ-ব্যবস্থা দুটী একসঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত থাকে।

(৩) জীবনের বাহ্য এবং আভ্যন্তরীণ বা শারীরিক এবং আধ্যাত্মিক উভয়দিক লক্ষ্য ক'রে এবং উভয়ের সামঞ্জস্য বজায় রেখে উৎপাদন এবং বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়। আপাত রমনীয় বা আপাত সুখকর অথবা আপাত লাভজনক দৃষ্টি রেখে কোনও কাজ করা হয় না।

(৪) অসহায় এবং দুর্বলকে রক্ষা করার সুযোগ থাকে। হাল্‌কা ভারি সব রকমের কাজ দুর্বল সবল, বালক বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ, অন্ধ, খঞ্জ ভেদে প্রত্যেকেই—সক্ষমতা অক্ষমতা, যোগ্যতা ও কুশলতা অনুযায়ী করবার সুযোগ পায়। উৎপাদনে প্রতিযোগিতা থাকে না। কাজেই কেবলমাত্র সক্ষম লোক নয়—সকলেই সুযোগ পায়।

৫। ব্যক্তিত্ব বিকাশের যথেষ্ট সুযোগ থাকে। প্রত্যেকেই স্বাধীনভাবে যে যার রুচি, বুদ্ধি এবং প্রেরণা দিয়ে স্ব স্ব বৃত্তি বা কাজে লেগে থাকতে পারে।

(৬) কতকগুলি সামাজিক আদর্শের দিকে লক্ষ্য রেখেই বৃত্তি

নির্ণয় ও তার ব্যবস্থা করা হয়। মদ, গাঁজা বা অন্যান্য মাদকদ্রব্যের উৎপাদন এবং সরবরাহে সমাজের নৈতিক পতন হয়। কাজেই সেই রকম দ্রব্য উৎপাদনের কোনও অবকাশ থাকে না। আপাত রমনীয় বা আপাত রুচিকর জিনিষের ব্যবহারে কিংবা নিত্য নূতন জিনিষের চাহিদা সৃষ্টি করলে মানুষের জীবন বহির্মুখী হয়ে দাঁড়ায়। সেইজন্য এই ব্যবস্থায় এতে তার অবকাশ থাকে যথাসম্ভব কম। সর্বজন হিতকর অন্তর্মুখী জীবন গড়ার চেষ্টা থাকে।

(৭) সমাজের সকলেই যাতে উপকৃত হয় সেইদিকে লক্ষ্য থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থায় অল্প লোকেই লাভবান হয় কিন্তু এই ব্যবস্থায় কৃষক মজুর, ধোপা, নাপিত, হাড়ি, মুচি, কামার, কুমোর স্ত্রী পুরুষ সকলেই যোগ্য কাজ পায়। সমস্ত সমাজ একটী পরিপারের আকার ধারণ করে।

(৮) এতে অপরকে শোষণের অবকাশ থাকে না বরং পরোপকার বৃত্তিরই প্রাধান্য থাকে।

(৯) মৌলিক আবশ্যকীয় উৎপাদন এবং নিয়ন্ত্রণ স্বাভাবিকভাবে সামাজিক ব্যবস্থার দ্বারাই হয়ে যায়। পৃথক কোনও সত্তার দরকার হয় না।

(১০) কেন্দ্রীয় ব্যবস্থায় উৎপাদকের সঙ্গে উপভোক্তার সম্বন্ধ একান্ত পরোক্ষ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সম্বন্ধ পরস্পর নিরপেক্ষ থাকে। কাপড়ের মিলে বা জুতোর কারখানায় হাজার হাজার জোড়া কাপড় বা জুতো তৈরী হয়। উৎপাদনের মালিক, ব্যবস্থাপক, কর্মচারী বা শ্রমিক কেহই জানেনা যে তাদের কারখানার কাপড় বা জুতো কে বা কারা পরবে।

কিন্তু বিকেন্দ্রীত ব্যবস্থায় এই সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরস্পর সাপেক্ষ। চাষী ধান দিয়ে কুমোরের হাঁড়ি নেয় বা কুমোর

হাঁড়ি দিয়ে চাষীর ধান নেয়। কুমোরের ধান না হ'লে চলে না এবং চাষীর হাঁড়ি না হ'লেও নয়। এতে সম্বন্ধটী যেমন প্রত্যক্ষ তেমনি পরস্পর সাপেক্ষও বটে। তাদের সম্বন্ধ শুধু জিনিষ পত্রের আদান প্রদানে নয়—দৈনন্দিন জীবনের নানাসূত্রে—পূজাপর্ব, বিবাহ শ্রাদ্ধ আদি নানা সামাজিক অনুষ্ঠানে। এতে তারা পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সূত্রে আবদ্ধ থাকে।

(১১) এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যুক্ত অর্থব্যবস্থায় প্রতারণা বা দুর্নীতির কোনও অবকাশ থাকতে পারে না। এতে উৎপন্ন জিনিষের সঙ্গে প্রাণের যোগ থাকে। এই রকম ব্যবস্থায় সমাজে সততার পরিবেশ সৃষ্টি করা সহজ।

(১২) এতে রুচি, বুদ্ধি এবং প্রতিভার সম্যক অনুশীলন সম্ভব হয়। এই ব্যবস্থায় বিশেষীকরণের (Specialisation) কোনও স্থান নাই। উৎপাদক সম্পূর্ণরূপে জিনিষটী নিজেই করে বা নিজের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানেই করে। জিনিষটী সম্পূর্ণরূপে নিজে করতে গেলে সম্পূর্ণরূপে নিজেরই বুদ্ধি রুচি এবং প্রতিভার প্রয়োগ করতে হয়। এই তিনটীর যথাযথ প্রয়োগেই মানুষের সৃজন-জনিত অমিয়-আনন্দ। এই সৃজন-জনিত আনন্দের অনুভূতি আছে বলেই মানুষ—মানুষ। পশুর তা নাই বলেই পশু—পশু! মানুষ এবং পশুর কর্মে ইহাই প্রভেদ।

কেবলমাত্র বিকেন্দ্রীত ব্যবস্থায় এই অনুভূতি সম্ভব। শুধু অনুভূতি নয়—বার বার নিজের বুদ্ধি, রুচি এবং প্রতিভার প্রয়োগের ফলে এই গুলির ক্রমশঃ বিকাশ হয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যবস্থায় বিশেষীকরণ পন্থা অবলম্বনে এই গুলির বিকাশ রুদ্ধ হয়। এই পন্থায় মানবজাতির অপূরণীয় ক্ষতি হ'য়েছে এবং এখনো হচ্ছে। লণ্ডন ইউনিভারসিটীর প্রসিদ্ধ মনোবৈজ্ঞানিক সার সিরিল বার্ট বলছেন "Human intelligence in Britain is declining at an alarming rate.

If the present rate of decline in England continues for another 50 years the number of young people of superior ability would be halved and the number of feeble-minded would be doubled" He had undertaken intelligence-testes over a period of 50 years. বৃটনবাসীর বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ক্রমে ভয়ঙ্কর ভাবে কমে যাচ্ছে। এইভাবে বছর পঞ্চাশেক চললে উচ্চস্তরের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ রুদ্ধ হয়ে যাবে এবং দুর্বলচিত্ত ব্যক্তির সংখ্যা যথেষ্ট বেড়ে যাবে।

(১৩) ব্যবস্থার সরলতা এবং সরসতা :—বিকেন্দ্রীত ব্যবস্থা অত্যন্ত সরল ও স্বাভাবিক।

(ক) কাঁচামাল উৎপাদন থেকে আরম্ভ করে পাকামাল তৈরী এবং বিক্রী পর্য্যন্ত কাজ উৎপাদক এবং উপভোক্তা পরস্পরের সহযোগে সম্পাদিত হয়। তেলী তার কাঁচামাল সরিষা সংগ্রহ করে তার প্রতিবেশী চাষীর কাছ থেকে। প্রত্যেক চাষীর ঘরই হয় তার সরিষার গুদাম। তাকে কোথাও পৃথক গুদাম করতে হয় না। পাকামাল (তেল) কত করবে তার জন্য ফটকাবাজী (Speculation) করবার বা দালাল আদির কোনও দরকার হয় না।

(খ) দূরস্থ বাজারে পাঠাবার জন্য রেল, মোটর, ডাক টেলিগ্রাফ আদির কোনও বালাই থাকেনা।

(গ) দূর দূরান্তে বাজার সৃষ্টির জন্য দেশজয় বা যুদ্ধ বিগ্রহের কোনও আবশ্যকতা করে না।

(ঘ) তেলীর তেল কোনও একশ্রেণীর নয়—সমাজের সমস্ত শ্রেণীই ব্যবহার করে। সে সকলকে তেল দেয় আর সকলের কাছ থেকে সে তার সর্বপ্রকার আবশ্যকতার পূরণ করে। আবাসের জন্য কেউ তার ঘর তৈরী করে দেয়। রান্না এবং গৃহকাজের জন্য কেউ তাকে

হাঁড়ি কলসী দেয়। কেউ তার কাপড় চোপড় কাচে কেউ বা তার ক্ষৌরকার্য্য করে। তার উৎসবে কেউ বাজনা বাজায় কেউ ফুল দেয় আর কেউ বা পূজা করে। সে যেমন সমাজের বাড়ী বাড়ী তার খাঁটি তেলটী যোগায়, সমাজের সকল শ্রেণীর লোকও তার পারিবারিক এবং সামাজিক সকল কাজে যোগ দেয়।

এইভাবে সমাজের আবশ্যকীয় যে কোনও জিনিষের জন্য কামার, কুমোর, তাঁতি মুচি ইত্যাদি জীবিকা হিসাবে যে কোনও বৃত্তি অবলম্বন করুক না কেন, তার বৃত্তি যেমন সমাজের সকল শ্রেণীর সেবায় লাগায় তেমনি সমস্ত সমাজও তার সেবায় তৎপর থাকে। এইভাবে সমাজের বিরাট ব্যবস্থা স্বাভাবিক ভাবে চলতে থাকে। 'দেবানভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ। পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপস্যথ' গীতার এই নীতির আধারেই এই সমাজ ব্যবস্থা।

আমাদের প্রাচীন রাজনীতি নিরপেক্ষ স্বাভাবিক অর্থ ব্যবস্থা—

আগে আমাদের দেশে রাজ্য ব্যবস্থার (রাজনীতি) সঙ্গে অর্থ ব্যবস্থার (অর্থনীতির) বিশেষ কোনও সম্বন্ধ ছিলনা। অর্থ ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ ছিল সামাজিক ব্যবস্থার সঙ্গে। সমাজে কামার কুমোর, তাঁতি, মুচি, কৃষক শিল্পী আদি বিভিন্ন বৃত্তিধারী সমাজের সকল প্রকার আবশ্যকতা পূরণ করতো পরস্পরের সহযোগে। সমাজে সমস্ত বৃত্তিধারীদের নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিল (পরে ইহা জাতিভেদে পরিণত হয়)। সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে থেকে যে যার কাজ করতো। প্রত্যেকেই ছিল সমাজ সেবক। প্রত্যেকের কাছে প্রত্যেকের মান ছিল। সমস্ত বৃত্তিধারীর সমাজে সমান সম্মান ছিল। কোনও সামাজিক অনুষ্ঠানে যেমন অমুক কাজে ব্রাহ্মণ না হলে অনুষ্ঠান আটকে যেতো

ঠিক তেমনি অমুক কাজে কুমোর চামার বা ধোপা নাপিত না হলেও অনুষ্ঠান আটকে যেতো। প্রত্যেকে স্ব স্ব রুচি, শক্তি ও কুশলতা অনুযায়ী বৃত্তি অবলম্বন করতো। প্রকৃতিদত্ত এই রুচি, শক্তি এবং কুশলতার আধারেই সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। সকলের জীবন সুখময় শান্তিময় প্রেমময় এবং পবিত্রতাপূর্ণ ক'রে তোলাই ছিল এই সমাজ ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য। 'সর্বেঅত্র সুখিনঃসন্তু সর্বে সন্তু নিরাময়া, সর্বে ভদ্রানি পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখমাপ্নুয়াৎ'—ছিল আমাদের সমাজ ব্যবস্থার আদর্শ।

ভগবদ্দত্ত গুণের বিকাশ ও বৃত্তি ধর্ম পালন

কাজেই সমাজ ব্যবস্থায় প্রকৃতিদত্ত (অন্য ভাষায় ভগবদ্দত্ত) মানবোপযোগী প্রত্যেক রুচি, গুণ এবং শক্তির সমান আদর ছিল। সেই রুচি, গুণ এবং শক্তিকে মানবজীবনের মর্ম উপলব্ধি করবার (বা ভগবানের মহিমা উপলব্ধি করবার) সাধন হিসাবেই গণ্য করা হতো। এই রকম পরিবেশপূর্ণ সমাজের পক্ষে প্রত্যেক মানুষের রুচি, গুণ এবং শক্তির সমান আদর করাই স্বাভাবিক ছিল। এইগুলিকে অবলম্বন করেই আজীবিকার জন্য বৃত্তি নির্দ্ধারণ করাও খুবই সহজ ছিল। লোকে বৃত্তি গুলিকে আজীবিকার এক একটী সাধন হিসাবে গ্রহণ করতো এবং পবিত্রতার সহিত এই বৃত্তিগুলি পালন করাকে নিজের ধর্মপালন মনে করতো। তখন ছিল বৃত্তিভ্রষ্ট হওয়া মানে ধর্মভ্রষ্ট হওয়া। এই ব্যবস্থায় ধার্মিক জীবন এবং আর্থিক জীবনে (ধর্মনীতি এবং অর্থ-নীতিতে) কোনও পার্থক্য ছিল না।

এই বৃত্তি-ধর্ম যথাযথভাবে পালন করার শিক্ষাই ছিল জন শিক্ষা। পিতার কাজে পুত্র যোগ দিত। কাজের কৌশল শিক্ষা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পিতা পুত্রকে সৎজীবন যাপন প্রণালীর কত আদর্শই না শিক্ষা দিতেন! আজ তেলীর তেলে ভেজাল, গোয়ালার দুধ দই ঘিতে

ভেজাল। আজ এই প্রতিযোগিতামূলক অর্থব্যবস্থার যুগে যে পেশাই ধরা যাক সর্বত্র ভেজালই ভেজাল। কিন্তু আগে সামাজিক ব্যবস্থায় এই বৃত্তিগুলির সঙ্গে ধর্মের এমন সম্বন্ধ ছিল যে বৃত্তি পালনে কোনও প্রকার ব্যতিক্রম হলেই ধর্মহানি ব'লে নিন্দনীয় হতো এবং এর প্রতিবিধানের জন্য সামাজিক শাসনের ব্যবস্থাও ছিল।

আমাদের সমাজের একটা উঁচু আদর্শ ছিল। সেই আদর্শকে লক্ষ্য ক'রেই সামাজিক ব্যবস্থার নির্ণয় হয়েছিল। রাজ্য ব্যবস্থার কাজ ছিল সেই সমস্ত সামাজিক ব্যবস্থার পরস্পরের মধ্যে মধুর সম্বন্ধ কায়েম রাখা। এতে সরকারকে বিশেষ কিছু জটিলতায় পড়তে হতোনা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতই এই কাজ করতো।

গ্রামসভ্যতা সহস্রমুখী—

সামাজিক ব্যবস্থা থেকে আর্থিক ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে রাজ্য ব্যবস্থার অঙ্গীভূত হওয়ার পর থেকেই আমাদের স্ব-শাসনের আধার গ্রাম পঞ্চায়েত গুলি একেবারে ধ্বংস হয়ে গেছে। ধ্বংস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্ব-শাসন, সু-শাসন, সু-আচার, সুবিচার সব কিছুই লোপ পেয়েছে। আগে গ্রাম বলতে যেন একটা সৌহার্দ্যপূর্ণ এবং সুখী পরিবার বোধ হতো। সেখানে যেন পারিবারিক নিয়মে সকলে মিলে সকলের সকল প্রকার অভাব অভিযোগ দূর করছে। সকলের সহযোগে সব কাজ নিষ্পন্ন হচ্ছে। নিজেদের সকল প্রকার আবশ্যকতা নিজেদের ব্যবস্থায় পূরণ করছে। এইভাবে পরস্পরের সঙ্গে যেন একটা ঘরোয়া সম্বন্ধ বোধ হতো।

আজ তেমন বোধ হয় না। সহরের মত গ্রামে আজ যেন কারও সঙ্গে কারো কোনও সম্বন্ধ নাই। সহরে যেমন লোকে কেবল অর্থ উপার্জনের সূত্রে এক সঙ্গে বসবাস করে সুখে দুঃখে যেমন কারো সঙ্গে কারো কোনও সম্বন্ধ নাই কোনও সামাজিক ব্যবস্থার বন্ধন নাই

আজ গ্রামগুলিও ক্রমে সেইরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গ্রামগুলি যেন ক্রমে এক একটী ছোট ছোট সহরে পরিণত হচ্ছে।

অর্থব্যবস্থা কেন্দ্রীয় রাজ্য ব্যবস্থার আওতায় আসায় গ্রামের সমস্ত সামাজিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে যাচ্ছে। ফলে কোর্ট, কাছারি আইন আদালত থানা জেল আদি ক্রমশঃ বিরাট আকার ধারণ করছে। সামান্য কিছু হ'লেই লোকে কোর্ট কাছারিতে হাজির হচ্ছে। সামান্য কিছুতেই পরস্পরের মধুর সম্বন্ধ নষ্ট হচ্ছে। সকলের জীবন যেন একটা প্রাণহীন যন্ত্রের ন্যায় না জানি কোন্ উদ্দেশ্য বিহীন পথে দ্রুত দৌড়ে চলেছে! এই পুঁজিবাদী কেন্দ্রীয় ব্যবস্থায় গ্রাম পঞ্চায়েত গুলি অকালে বিনষ্ট হয়েছে। ফলে গ্রাম্য জীবনের মাধুর্য্যও একেবারে লোপ পেয়েছে।

বিকেন্দ্রীকরণ ও শাসনহীন সমাজ :—এ সব থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় বিকেন্দ্রীকরণ। এই বিকেন্দ্রীকরণই সর্বোদয় সমাজ ব্যবস্থার মৌলিকত্ব। সারা সৃষ্টির ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। স্রষ্টা প্রত্যেক ব্যক্তিকে চোখ, মুখ, নাক, কান, হাত, পা ইত্যাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় এবং সঙ্গে সঙ্গে মন, বুদ্ধি ও বিবেক দিয়েছেন যাতে প্রত্যেকে নিজের চোখে দেখতে পারে, নিজের কানে শুনতে পারে নিজের পায়ে হাঁটতে পারে বা সোজা কথায় প্রত্যেকে নিজের চেষ্টায় নিজের অস্তিত্ব রক্ষায় সচেষ্ট হতে পারে এবং নিজের চেষ্টায় নিজের সম্যক বিকাশ লাভে সমর্থ হয়। স্রষ্টা যত বড় শক্তিশালী হউন না কেন এই রকম বিকেন্দ্রীত ব্যবস্থা না করলে সৃষ্টি চেতনময় না হয়ে একেবারে জড়বৎ হয়ে দাঁড়াতো। এই ব্যবস্থায় স্রষ্টাকে দেখা যায় না অথচ এই বিরাট সৃষ্টি অব্যাহত গতিতে চলেছে। প্রকৃতির এই স্বাভাবিক নিয়মকে অবলম্বন ক'রেই এই সর্বোদয় সমাজ ব্যবস্থা বা শাসন শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা। মানুষের শোষণ হয় অর্থ-

নীতিক ক্ষেত্রে এবং শাসন হয় রাজনীতিক ক্ষেত্রে। সমাজকে শোষণ-হীন করতে হলে যেমন দরকার হয় অর্থনীতিক ব্যবস্থার বিকেন্দ্রী-করণ তেমনি সমাজকে শাসনহীন করতে হলে দরকার রাজনীতিক ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ।

সর্বোদয় সমাজের আদর্শ স্থিতিতে রাজসত্তার কোনও অস্তিত্ব থাকবেনা। সমাজের সকলে বিবেকবুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে স্ব-স্ব ব্যক্তিগত এবং সামাজিক কর্তব্য সম্পাদন করবে। 'স্বে স্বে কর্মণি অভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ'—ইহাই সর্বোদয় সমাজের আদর্শ স্থিতি এবং ইহাই পূর্ণ মানবতা প্রাপ্ত সমাজ। কিন্তু মানুষ পূর্ণ নয়। পূর্ণতা প্রাপ্তিই তার লক্ষ্য। একমাত্র বিকেন্দ্রীত ব্যবস্থার দ্বারাই তার পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হওয়া সম্ভব বা সেই আদর্শের ভিত্তি স্থাপন সম্ভব।

শাসনহীন সমাজের ভিত্তি—বিকেন্দ্রীত গ্রামরাজ্য ঃ—সেই ভিত্তি স্থাপনের বাস্তব উপায় হিসাবে ভারতীয় কৃষ্টি, সংস্কৃতি এবং সভ্যতার দিক দিয়ে এক একটি গ্রামই এই বিকেন্দ্রীত রাজনীতিক ব্যবস্থার এক একটি একক্ হিসাবে গণ্য হবে। ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনের মৌলিক আবশ্যকীয় সমস্ত বস্তু বর্তমান ব্যবস্থা অনুযায়ী হিসাবে এক একটি বিরাট রাজ্যের রাজধানী থেকে নিয়ন্ত্রিত না হয়ে এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামরাজ্যে প্রত্যেকের প্রত্যক্ষ যোগাযোগে সম্পন্ন হবে। প্রত্যেকের প্রত্যক্ষ সহযোগে এবং প্রত্যক্ষ নির্বাচনে গ্রাম পঞ্চায়তগুলি গঠিত হবে। সেই পঞ্চায়তের মারফতেই সকলে নিজেদের যাবতীয় ব্যবস্থা —অনিবার্যরূপে মৌলিক আবশ্যকীয় ব্যবস্থা—নিজেরাই সম্পন্ন করবে। গ্রামের সমস্ত সম্পদ সেই পঞ্চায়তের তত্ত্বাবধানে থাকবে। মোট কথা গ্রামগুলি এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্ররূপে গণ্য হবে। জনমঙ্গলের জন্য বৃহৎ রাষ্ট্র বৃহদাকারে যা করে এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামরাষ্ট্র গুলি ক্ষুদ্রাকারে প্রায় সেই সমস্ত কাজই করবে। তবে তফাৎ এই যে ছোট বড়

প্রত্যেকটি ব্যক্তির বিবেকবুদ্ধি জাগ্রত কববার জন্য ছোট বড় প্রত্যেকটি ব্যবস্থার সত্তা যতদূর সম্ভব কমিয়ে ফেলার দিকে এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামরাজ্যগুলির ব্যবস্থা থাকবে যাতে প্রত্যেকের জীবনের সর্বক্ষেত্রে সম্যকভাবে নেতৃত্বশক্তি এবং কর্তব্যবোধ জেগে উঠে। ফলে এমন সময় আসবে যখন মুখ্য কেন্দ্রে এবং এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামরাষ্ট্রে ও সত্তার অস্তিত্ব একেবারে লোপ পাবে। এইভাবে ক্রমে শাসনহীন সমাজ গড়ে উঠবে।

এই সহযোগিতামূলক সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তির ন্যায় প্রত্যেকটি গ্রাম প্রত্যেকটি গ্রামের অভাব এবং অপূর্ণতা পূরণে যত্নশীল হবে। এই ভাবেই ব্যক্তিতে এবং গ্রামে মানবতা মূর্ত রূপ নিবে।

গ্রামরাজ্যে ভূমিব্যবস্থা :—পঞ্চভূতের মত ভূমিতেও গ্রামবাসীর সবারই সমান অধিকার থাকবে। কোনও ব্যক্তিগত মালিকানা থাকবে না। গ্রামের সমস্ত সম্পদের গ্রামীকরণ হবে।

এই খানেই শেষ নয়। আমাদের দৃষ্টি আরও উদার হবে। কোনও গ্রামে বা কোনও দেশে লোক সংখ্যার অনুপাতে জমি কম হ'লে এক গ্রামের লোক অন্য গ্রামে বা এক দেশের লোক অন্য দেশে গিয়ে বসবাস করতে পারবে। যে যেখানে থাকতে চায় থাকতে পারবে। যে যেখানে সেবা করতে চায় সেবা করতে পারবে। মানুষমাত্রেই জগতের নাগরিক হবে। ভারতের মাটি ভারতবাসীর, আমেরিকার মাটি আমেরিকাবাসীর বা ইংলণ্ডের মাটি ইংলণ্ডবাসীর এমন হবে না। কোথাও কোনও প্রকার আর্থিক, সামাজিক বা রাজনীতিক ভেদের প্রাচীর থাকবে না।

ব্যবস্থার সুবিধার জন্য গ্রামরাজ্যে ব্যক্তির হাতে ও কিছু জমি রাখা হবে। কিন্তু জমি তাদেরই হাতে থাকবে যারা জমির যথোচিত সদ্ব্যবহার করতে পারবে।

আর্থিক ব্যবস্থার প্রধানতঃ দুটি বিভাগ হবে—কৃষি এবং শিল্প।

প্রকৃতিদত্ত বা ভগবদ্দত্ত, শক্তি, রুচি এবং যোগ্যতা অনুযায়ী যার যে কাজে প্রবণতা বেশী বৃত্তি হিসাবে সে সেই কাজ করবে। তাছাড়া যে যে বৃত্তিই অবলম্বন করুক না কেন সামাজিক কর্তব্য হিসাবে প্রত্যেকেই ব্যক্তি-স্বাবলম্বন মূলক কৃষি এবং শিল্প করবে। প্রত্যেকেই প্রাত্যহিক করণীয় হিসাবে ব্যক্তি-স্বাবলম্বনমূলক, পরিবার-স্বাবলম্বনমূলক বা গ্রাম-স্বাবলম্বনমূলক কৃষি এবং শিল্প কার্য্যে শরীরশ্রম করবে। উৎপাদনমূলক শরীরশ্রম নাগরিকতার সর্তরূপে গণ্য হবে।

'গ্রামের মৌলিক প্রয়োজন গ্রামেই মিটাতে হবে' এই নীতির ভিত্তিতেই কৃষি ও শিল্প ব্যবস্থা হবে। 'মনুষ্য খাদ্য, পশু খাদ্য, ভৈষজ্যবস্তু এবং শিল্পের জন্য আবশ্যকীয় কাঁচামাল গ্রামের জমি থেকেই উৎপাদন করতে হবে' এই নীতির ভিত্তিতেই জমি আবাদ হবে। কৃষির জন্য যতটুকু জমি এবং তাতে যতজন লোক দরকার বা যে কয়টি শিল্প এবং তাতে যতজন লোক দরকার সমস্ত হিসাব ক'রে কাজের ব্যবস্থা হবে।

গ্রাম পঞ্চায়তের হাতেই গ্রামের সমস্ত জমি থাকবে। বৃত্তির আধারেই হিসাব ক'রে আবাদের জন্য প্রত্যেক পরিবারকে জমি দেওয়া হবে। কিন্তু 'সমস্ত গ্রামটিই এক পরিবার' এই হিসাবে প্রত্যেকটি ব্যক্তি মনে করবে 'গ্রামের সমস্ত জমি আমার।' স্বভাবতঃই কৃষিজীবির হাতে বেশী জমি এবং শিল্পজীবি বা অন্যান্য শ্রেণীর সমাজ সেবীদের হাতে কম জমি থাকবে কিন্তু প্রত্যেকেই মনে করবে আমার দরকার হ'লে আমি আরও জমি পাব বা দরকার হ'লে আমার হাত থেকে অন্যের হাতেও জমি যাবে।

প্রতি ৮।১০ বছর অন্তর জমির পুনর্বণ্টন হবে। ঐ সময়ের জন্য জমি ব্যক্তি বা পরিবারের হাতে থাকবে। প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত বা পারিবারিক দায়িত্বে জমি আবাদ হবে। কোনও গ্রাম বা গ্রামের কিছু পরিবার সুবিধা মনে করলে সমবায় প্রথায়ও জমি আবাদ করতে

পারবে। কেউ কোনও কারণে জমি অনাবাদী ফেলে রাখলে গ্রাম পঞ্চায়তই সেই জমি আবাদের আবশ্যক ব্যবস্থা করবে।

সূত্ররূপে নিম্নের কয়েকটি কথায় গ্রাম রাজ্য এবং গ্রাম-রাজ্যের সংগঠন সম্বন্ধীয় সুস্পষ্ট চিত্র অঙ্কিত হতে পারে—

১। প্রত্যেকটী গ্রাম এক একটি পূর্ণ শক্তিশালী পঞ্চায়েত বা জনতন্ত্র হবে। সমস্ত বিষয়ে এমন স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করবে যাতে সমস্ত সংসার থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে। গ্রাম পঞ্চায়েতের ন্যায়বিভাগ, শান্তি ও শৃঙ্খলা বিভাগ এবং আইন ও ব্যবস্থা বিভাগ ত থাকবেই তাছাড়া দরকার মত অন্য আবশ্যক বিভাগও থাকবে।

২। বাহিরের আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করবার চেষ্টায় মরবার শিক্ষা তার থাকবে এবং মরবার জন্য প্রস্তুত থাকবে। আত্মরক্ষায় প্রত্যেক গ্রাম স্বাবলম্বী হবে।

৩। এক গ্রামের সঙ্গে অন্য গ্রামের পারস্পরিক সহায়তা এবং নির্ভরতা স্বেচ্ছাকৃত হবে।

৪। স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেকে তার আবশ্যকতা সম্বন্ধে সচেতন থাকবে। কেউ এমন জিনিষ পেতে চাইবে না যেটা সেই পরিমাণ পরিশ্রম ক'রে অপরের পাওয়ার সুযোগ নাই।

৫। প্রত্যেক ব্যক্তিই হবে এক একটি একম্। ব্যক্তিই এই প্রকার অগণিত গ্রামগুলির সামুদায়িক জীবনের কেন্দ্র হবে।

৬। ব্যক্তি গ্রামের স্বার্থের জন্য এবং গ্রাম—গ্রাম সমুদায়ের ন্যায়-সঙ্গত স্বার্থের জন্য—মরতে প্রস্তুত থাকবে। এই ভাবে গঠিত ব্যক্তিদের সমবায়ে এক একটি সংঘ হবে। সেই সংঘের শক্তি নিজের অন্তর্গত কোনও ব্যক্তির কোনও সদবৃত্তিকে দাবিয়ে দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত হবে না। বরং তাহা নিজের অন্তর্গত সকলকে শক্তি দিবে।

ইহাই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের আধারে গঠিত পূর্ণ জনতন্ত্র। ব্যক্তি হবে নিজের শাসনের নিজেই নির্মাতা। তার শাসনের নিয়মন অহিংসার দ্বারাই হবে।

৭। গ্রামে ভজন, নাচ, গান, কথকতা, পটও চিত্রাদি প্রদর্শনের ব্যবস্থা হবে। যতদূর সম্ভব গ্রাম্য সাধনের দ্বারাই ঘর তৈরী-গৃহস্থালী ও আসবাব পত্র তৈরী হবে। লোকের মধ্যে শিল্পানুরাগ থাকবে। প্রত্যেক কাজে পরিচ্ছন্নতা এবং সৌন্দর্য্য বোধ ফুটে উঠবে।

৮। প্রত্যেকের ভুল করবার যেমন স্বাধীনতা। থাকবে তেমনি ভুল সংশোধনের কর্তব্য ও সে পালন করবে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে স্বশাসন এবং আত্মনিয়ন্ত্রনের অবকাশ থাকবে।

৯। সর্বাপেক্ষা নগণ্য ব্যক্তির ও স্বাধীনতা থাকবে। প্রত্যেক ব্যক্তির আবশ্যক ক্ষেত্রে সত্যাগ্রহ করবার অবকাশ থাকবে।

১০। রাজ্যের প্রত্যেক সদস্য সমস্ত সংসারের বিরুদ্ধে নিজেরা ন্যায়-সঙ্গত স্বাধীনতা বজায় রাখবার সুযোগ পাবে।

সর্বোদয়ের ভবিষ্যৎ

ইতিহাস বলে প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থায় হিংসার (Violence) প্রাবল্য ছিল। এযুগে দেখছি অন্যায়ের (Injustice) প্রাবল্য। মনীষিরা বলেন পরবর্ত্তী যুগের সমাজ-ব্যবস্থায় থাকবে পরিপূর্ণ এবং পরিশুদ্ধ প্রেম (Love). সর্বোদয়ই সেই পরবর্ত্তী যুগের সূচনা করছে। পৃথিবী ক্রমে শান্তি ও প্রেমের অনুসন্ধানে এগিয়ে চলেছে।

পৃথিবী পুঁজিবাদের অন্যায় (Injustice) থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সমাজবাদকে আশ্রয় করল কিন্তু বিফল হ'ল। এখন সমাজবাদ বাস্তব পক্ষে তার আদর্শ থেকে অনেক দূরে। এখন পার্লামেণ্টারী বা বৈধানিক কাজ ছাড়া যেন তার অন্য কোন কাজ নাই। রাজগদি দখল করে আইনের দ্বারাই সামাজিক পরিবর্তন করা যায় এই তার বিশ্বাস। এই জন্য রাজগদি দখল বা রাজসত্তা হাতে লওয়ার অহরহঃ সংঘর্ষ। শ্রেণীহীন সমাজ রচনা করতে গিয়ে অহরহঃ শ্রেণী সংঘর্ষ। জনশক্তি বাড়াতে গিয়ে বাড়াতে চায় রাজশক্তি বা রাজসত্তা। সরকারবিহীন সমাজ গড়তে গিয়ে করতে চায় সরকারকে সর্বশক্তিমান।

এল সাম্যবাদ। আশা হ'ল পৃথিবী থেকে অন্যায় বৈষম্য লোপ পাবে। কিন্তু না। সে ও পথ হারাল। সাম্যবাদ সংগঠিত ধনতন্ত্রবাদ, আমলাতন্ত্রবাদ এবং সর্বাধিনায়কবাদে (Totalitarianism) পরিণত হ'ল। সরকারবিহীন সমাজ (Stateless-society) গড়ার পরিবর্ত্তে বিরাট শক্তিশালী রাষ্ট্রসংগঠন ক'রল। হিংসা এবং অন্যায়ের মূলোচ্ছেদ হ'ল না।

এই উভয় 'বাদ' পৃথিবীময় ছড়াল। ভারতেও এলো। কেউ লেনিনবাদী মার্ক্সবাদ ধরলো আর কেউ বা মার্ক্সবাদী ভৌতিকবাদ। ফলে অন্যান্য দেশের ন্যায় এখানেও সেই কেন্দ্রীয় রাজশক্তি বাড়াবার প্রচেষ্টা। এখানেও সেই রাজগদি দখলের জন্য বিভিন্ন দলের সংঘর্ষ। সেই অন্যায় সেই হিংসা।

এখন পৃথিবী এ সব থেকে মুক্তি চায়। বর্তমান পরিবেশ একেবারে অসহ্য। মানুষ চায় সমস্ত সমাজ অহিংসা এবং প্রেমের ধারায় গড়ে উঠুক। সর্বোদয়ই সেই ধারা। সে ধারায় না আছে রাজগদি দখলের সংঘর্ষ ন' আছে আইন প্রণয়নের মার প্যাঁচ আর না আছে হিংসাত্মক কার্য্যপদ্ধতি। গণিতের হিসাবে সে ধারায় রাজশক্তির মূল্য '0' শূন্য এবং জনশক্তির মূল্য সংখ্যা। সংখ্যা ছাড়া পৃথক ভাবে শূন্যের '0' কোনও মূল্য হয় না। সংখ্যার সঙ্গে যুক্ত হলেই তার মূল্য। সংখ্যা ছাড়া শূন্যের মূল্য যেমন জনশক্তি বিহীন রাজশক্তিও তেমনি। জনসমর্থন বিহীন আইন—আইন নয়। আইনের দ্বারা না হয় কোনও বিপ্লব আর না হয় মানুষের জীবনমূল্যের কোনও পরিবর্তন। আইন বা সরকার ত জন-মানসেরই প্রতিবিম্ব মাত্র। আসলে জন-মানসই সব কিছু। মানুষের মানসিক পরিবর্তন না হওয়া পর্য্যন্ত সব আইন সব বিধানই ব্যর্থ। এই জন্য জন-মানস বা জন-হৃদয় পরিবর্তনই সর্বোদয়ের প্রধান—বা বলা যেতে পারে—একমাত্র কাজ। জনহৃদয় পরিবর্তনের দ্বারাই আর্থিক, রাজনীতিক বা সামাজিক সর্বপ্রকার বিপ্লব সম্ভব—আইনের দ্বারা নয়। অহিংসাত্মক সমাজ গঠনই সর্বোদয়ের আদর্শ। সেইজন্য জন-হৃদয়কে সর্বপ্রকারে অহিংস এবং প্রেমপূর্ণ করে তোলার অনুকূল কর্মপন্থাই তার কর্মপন্থা।

ভারত সেই কর্মপন্থায় কাজ আরম্ভ করেছে। সফলতাও লাভ করেছে। অহিংস উপায়ে হৃদয় পরিবর্তনের দ্বারা রাজনীতিক

স্বাধীনতা লাভ পৃথিবীর ইতিহাসে এক সম্পূর্ণ অভিনব ব্যাপার। গান্ধীজীর এই দান পৃথিবীর ইতিহাসে অদ্বিতীয়। এখন ভারতের আর্থিক, রাজনীতিক এবং সামাজিক বিপ্লব সেই ধারায় হ'তে চলেছে।

আর্থিক সংগঠনের মূল হচ্ছে ভূমি। এই ভূমি থেকেই সমাজের সর্বপ্রকার সম্পদ এবং এই ভূমি বৈষম্য থেকেই সর্বপ্রকার বৈষম্য বিভেদ, বিদ্বেষ এবং হিংসার সৃষ্টি। আচার্য বিনোবা ভাবে তাই সর্বোদয় ধারায় এর মূলোচ্ছেদ আরম্ভ করেছেন। তাঁর প্রবর্তিত ভূদান যজ্ঞ এবং সম্পত্তিদান যজ্ঞ পৃথিবীর ইতিহাসে একেবারে অভূতপূর্ব। যে ব্যক্তিগত মালিকানা জগতের সর্বপ্রকার অশান্তির মূল এ যজ্ঞে সেই মালিকানারই আহুতি। সমস্ত সমাজই এক পরিবার এই উদার-হৃদয়তাই এই যজ্ঞের কাম্য।

অল্প দিনের মধ্যেই এই যজ্ঞ ভারতে আর্থিক, সামাজিক এবং রাজনীতিক বিপ্লবের সূত্রপাত করেছে। এই যজ্ঞের বার্তা কানে পৌঁছবামাত্রই লোকের হৃদয় সৌহার্দ্য, অহিংসা এবং প্রেমে ভরে উঠছে। শুধু ভারত নয়—সমস্ত পৃথিবীর দৃষ্টি এখন এর দিকে। সকলেই এর সফলতা কামনা করছে।

ভারত এই ধারায়—দ্রুত এগিয়ে চলেছে। গান্ধীবাদীদের ত কথাই নাই—প্রজা সমাজবাদী দল, কংগ্রেস, আদি প্রধান অপ্রধান প্রায় সমস্ত রাজনীতিকদল এমন কি স্বয়ং ভারত সরকারও এই যজ্ঞের সমর্থন করছেন। অনেক চিন্তাশীল লোক বৈধানিক পন্থা বিসর্জন দিয়ে এই পন্থায় আত্মনিয়োগ করছেন। এই আন্দোলনের সহায়তায় সকলের হৃদয় আপ্লুত এবং এর সফলতা সম্বন্ধে সকলেই নিঃসন্দিগ্ধ। এই যজ্ঞে জন-হৃদয়স্থিত হাজার হাজার বছরের মোহ, স্বার্থ, হিংসা বিদ্বেষ আদি সর্বপ্রকার আবিলতা স্বাহা হয়ে যাচ্ছে। ধনী দরিদ্র ইতর ভদ্র সকলের প্রাণে এক নতুন ভাবের সঞ্চার হয়েছে।

সকলের হৃদয়ে দেবত্ব ফুটে উঠছে। আসুন! আমরা সকলে এই সর্বজন হিতকর কাজে আত্মনিয়োগ করি এবং ভগবানের কাছে এই আন্দোলনের সাফল্য কামনা করি।

সমানী ব আকুতি সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি॥
ওঁ সহনাববতু সহনৌ ভুনক্তু সহবীর্য্যং করবাবহৈ
তেজস্বিনাবধীতমস্তু মা বিদবিষাবহৈ।

ওঁ শান্তি! শান্তি! শান্তি!

শুদ্ধি পত্র

পৃঃ	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪১	২৩	বেতনের	বিতরণের
৪৯	১৫	শ্রেণীরহিত	শ্রেণীর হিত
৫৬	২৩	পুঁজি রাজ্য এলে	পুঁজি এলে রাজ্য
৭৮	৬	অন্তরের পথে	অনন্তের পথে
৮০	১১	সর্বোত্র	সর্বে অত্র

অবশ্যপাঠ্য সর্বোদয় গ্রন্থসূচি

সর্বোদয় ও স্বতন্ত্র লোকশক্তি	আচার্য বিনোবা	৶০
সর্বোদয়ের কর্মসূত্র ও আত্মবিশ্লেষণ	" "	৶০
ভূদান যজ্ঞ কি ও কেন	চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী	॥০
স্বাধীনতার সংকট	ধীরেন্দ্র মজুমদার	॥০
স্বরাজের আসল লড়াই	" "	॥০
বিজ্ঞান, স্বাধীনতা ও শান্তি	আলডুস হাক্সলে	২৲
বিনোবাজীর ভূদান যজ্ঞ আন্দোলন	শংকর রাও দেও	৶০
ভূদান যজ্ঞ ও সর্বোদয় সমাজ	বীরেন্দ্রনাথ গুহ	⁄১০
Gandhi & Vinoba	Birendranath Guha	-/3/-